৮.১২ পিরামিডের অভ্যন্তরে (১) – Bangla Library

৮.১২ পিরামিডের অভ্যন্তরে (১) – Bangla Library

পিরামিডের অভ্যন্তরে (১) -১৩২

মিঃ রিজভীর বাড়িতে আজ মহা উৎসব। মিঃ রিজভীর কন্যা মাসুমার বিয়ে। অপরূপ সাজে সাজানো হয়েছে মিঃ রিজভীর বাসভবন। আলোয় আলোকিত গোটা বাড়িখানা। আনন্দ আর হাসিগানে ভরপুর। রাজপ্রাসাদময় অট্টালিকার সামনে সারি সারি মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

একটি গাড়ি ফুলে ফুলে সাজানো।

ঐ গাড়িখানাতেই বর এসেছে।

আরাকানের খান বাহাদুর মাসুদুর খানের পুত্র আরিফুর খানের সঙ্গে মিঃ রিজভীর একমাত্র কন্যা মাসুমার বিয়ে। মিঃ রিজভী আরাকানের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মিঃ চৌধুরীবেশে স্বয়ং দস্যু বনহুর, মিঃ আহাদ এবং মিসেস ক্যাথোলিন-বেশি রাণী উপস্থিত আছে বিয়েবাড়িতে।

মাসুমার বিয়ে, আজ আনন্দ যেমন মিঃ রিজভীর তেমনি খুশিতে উচ্ছ্বসিত রাণী ও বনহুর, কারণ মাসুমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়েই তারা আজ আরাকান এসেছে। মাসুমাকে যদি তারা ফিরে না পেতো তাহলে তাদের সবই যেন ব্যর্থতায় ভরে উঠতো। মিঃ রিজভী আজ শত্রুমুক্ত, শুধু শত্রুমুক্তই নন, তিনি মৃত্যুর গহবর থেকে উদ্ধার পেয়েছেন, তাই প্রাণভরা আনন্দ আর শুকরিয়া করছেন তিনি করুণাময়ের দরগায়।

কন্যা মাসুমার জীবনে নেমে এসেছিলো এক চরম অভিশাপ। আজ তার কলংক মুছে ফেলে মহান হৃদয় মাসুদুর খান তাকে পুত্রবধূ করে নিলেন, এ মহত্ত্বের যেন পরিমাপ নেই। সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত যুবক আরিফ খান বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করলো মাসুমাকে। মাসুমার চোখভরা অশ্রু, মনভরা আনন্দ।

বনহুর আর রাণী আশীর্বাদ করলে নববধূ মাসুমা ও বর আরিফুর খানকে, বহু মূল্যবান একটা হীরার আংটি উপহার দিলো ওরা তাদেরকে।

বিয়ের পর বিদায় গ্রহণ করলো বনহুর, রাণী আর মিঃ আহাদ। মিঃ রিজভী এবং মাসুমা ও তার স্বামী আরিফুর খান সবাই মিলে গেলেন বিমান বন্দরে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

বিদায় মুহূর্তে মিঃ রিজভী আর মাসুমার চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। রুমালে চোখ মুছলেন মিঃ রিজভী, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন-আপনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বনহুর দীপ্তকণ্ঠে বললো–মানুষের যা কর্তব্য তা পালন করেছি মাত্র, আর কিছু নয়। বিদায় মিঃ রিজভী, বিদায় মাসুমা এবং আরিফুর খান, আপনাদের জীবন সুখী, সুন্দর হোক কথাটা বলে বনহুর বিমানের দিকে পা বাড়ালো, রাণী ও মিঃ আহাদও এগিয়ে গেলেন বিমানের দিকে।

এবারের মত রাণীর মাথুন দ্বীপ যাত্রা হলো না।

বনহুর ও মিঃ আহাদ পাশাপাশি বসেছিলো।

রাণী বসেছিলো বিমানের জানালার পাশে। তাকিয়েছিলো সে নিচে আরাকান শহরটির দিকে। মনে পড়ছিলো তার মাসুমার কথা, তাকে ফিরে না পেলে আজ তারা স্বচ্ছ মন নিয়ে ফিরে যেতে পারতো না। একটা দারুণ ব্যথা তাদের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। শুধু মাসুমার মুখেই নয়, মিঃ রিজভী এবং বেগম রিজভীর মুখেও হাসি ফোঁটাতে পেরেছে তারা এ যে তাদের জন্য পরম আনন্দের ব্যাপার। রাণীকে আরও মুগ্ধ, অভিভূত করেছিলো, তাহলো মাসুদুর খান পরিবারের মহত্ত্ব। তারা মাসুমাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়েছেন-এটা অনেক বড় মানবতা।

বললো বনহুর–রাণী কি ভাবছো? মাথুন যাত্রা ব্যর্থ হলো বলে দুঃখ পাচ্ছো।

মিঃ আহাদ বনহুরের কথায় যোগ দিয়ে বললেন-মাখুন বোধ হয় ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হ্যাঁ, তোমাদের কথা মিথ্যা নয় আহাদ। আমি জানি মাথুনের অভ্যন্তরে এত সম্পদ আছে যা পৃথিবীর কোথাও নেই। ঐ সম্পদ যদি তুলে আনতে পারতাম তাহলে পৃথিবীর দুঃস্থ অসহায় মানুষগুলোকে এমন ধুকে ধুকে মরতে হতো না। আমি প্রাণভরে বিলিয়ে দিতাম তাদের মধ্যে। ওদের মুখে হাসি ফুটতো, আমি দেখতাম....তবে হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমি যা ভাবছিলাম তা মাথুন দ্বীপের কথা নয়। ভাবছিলাম-মাসুমার কথা, ভাবছিলাম হৃদয়বান খান বাহাদুরের কথা-কত মহৎ ব্যক্তি তিনি। তিনি ও তার তরুণ পুত্র আরিফুর খানের আদর্শ সারা বিশ্বের মানুষের শিক্ষনীয়। তাদের এ মহত্ত্ব, এ উদারতা সবার অনুসরণ করা উচিত তাহলে নির্যাতিত, নিপীড়িতা নারীদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।

ঠিক বলেছো রাণী। মাসুমা সম্বন্ধে সবই অবগত হয়েছি। তার জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে নিমজ্জিত হতো, একটা সুন্দর ফুলের মত জীবন অকালে ঝরে যেতে যেমন আরও বহু ঘটেছে। নারী জীবন এত ঠুনকো, নিজের দোষে নয়, নরপশুদের লোভাতুর চক্রের শিকার হয়ে যদি কেউ গৃহহারা হয় তখন সমাজ তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। একবার কেউ ভেবেও দেখে না সেই নিরপরাধ মেয়েটির কি দোষ! নানা বিপর্যয় এসে গ্রাস করে তখন সেই অসহায়

তরুণীটিকে। সমাজ তাকে উপহাস করে, লাঞ্ছনা-তিরস্কার এমন কি তাকে কুপথে পা বাড়াতে উৎসাহী করে সেই সম্মানিত সমাজ। সত্যি, আরাকান এসে আমি আরও একটি সুন্দর জিনিস উপলব্ধি করলাম, তা ঐ মাসুমার জীবনের মধুময় পরিবেশ। আরাকানের মানুষ বাঁধার প্রাচীর সৃষ্টি করেনি মাসুমার জীবনে। কথাগুলো শান্তকণ্ঠে বললেন মিঃ আহাদ।

বনহুর চুপ করে শুনছিলো, এবার সে বললো–সমাজ তো মানুষ তৈরি করেনি, মানুষই তৈরি করেছে সমাজকে। কাজেই মানুষ তাদের তৈরি সমাজকে যেভাবে যে পথে নিয়ে যাবে, সমাজ সেভাবে সে পথেই চলবে। হ্যাঁ, মাসুমা সত্যিই এ ব্যাপারে নিরপরাধ। মিঃ মাসুদুর খান-তাকে পুত্রবধু হিসেবে গ্রহণ করে মানবতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিমানের পাশ কেটে ভেসে যাচ্ছে হাল্কা তুলোর মত শুভ্র মেঘগুলো। সূর্যের আলো পড়ে চক চক করছে মেঘের খন্ডগুলো রূপালী রাজহংসীর মত। বিমানটি এখন পৃথিবীর মাটি থেকে অনেক উপরে। নিচে কিছুই নজরে পড়ছে না। দু'পাশের জানালা দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় খন্ড খন্ড মেঘের ফাঁকে গভীর নীল আকাশের দিকে।

মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে বিমানবালার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমাদের বিমান লাকাসা বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছে। লাকাসা থেকে ফেরু বিমান বন্দর। তারপর হিম সাগরের বুকের ওপর দিয়ে বিমান চলবে প্রায় দেড় ঘন্টা, তারপর হিন্দোল বিমান বন্দর। সেখানে একদিন বিমান অপেক্ষা করবে, পরদিন আবার চলবে.....এমনি নানা বিমান বন্দর অতিক্রম করে তারা পৌঁছবে রায়হান বিমান বন্দরে।

রাণী আর মিঃ আহাদ রায়হানে নেমে যাবে।

বনহুর ফিরে যাবে কান্দাই।

যেখানে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে তার অনুচরগণ। প্রতীক্ষা করছে নূরী, জাভেদ, ফুল্লরা আর অশ্ব তাজ। অজানা-অচেনা একটি কুকুর তাকে ধরা দিয়েছিলো, বনহুর তার নাম রেখেছিলো বাঘা। বনহুরের মনে মাঝেমধ্যেই বাঘার মুখটা ভেসে ওঠে। বড় প্রভুভক্ত কুকুর বাঘা। মনে পড়ে মনিরা, নূর আর মায়ের মুখখানা। বনহুরের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে মায়ের কথা স্মরণ হলে। জননী

আর জন্মভূমি, এ দুটো আকর্ষণ বনহুরকে বেশি বিচলিত করে। আপন মনে মাঝে মাঝে তাই সে মা বলে ডাকে, মন তখন শান্তিতে ভরে ওঠে। মা বড় মধুর, বড় শ্রদ্ধার।

কান্দাই ফিরেই বনহুর মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। কেন জানি না বারবার তার মনে মায়ের মুখ ভেসে উঠছে। এমন করে তার কোনোদিন মাকে মনে পড়েনি। এবার আরাকানে আসার পর থেকে সর্বক্ষণ হৃদয়ে একটা ব্যথা অনুভব করেছে বনহুর, কত দিন সে মাকে দেখেনি, না জানি মা কেমন আছেন।

বনহুর সবার অজ্ঞাতে নির্জন স্থানে নামায আদায় করতো। জীবনের প্রথম থেকেই সে আল্লাহতালার ওপরে শ্রদ্ধাশীল ছিলো, তার প্রতি বিশ্বাস তাকে সবকাজে জয়ী করেছে। বনহুর তার মায়ের কাছে এ শিক্ষা পেয়েছিলো। একদিন মরিয়ম বেগম বলেছিলেন, বাবা মনির, যখন যেখানেই থাকো নামায আদায় করবে। একমাত্র তিনিই তোমার সহায়, এ কথা কোনো মুহূর্তে ভুলে যেও না।

তখন বনহুর তরুণ, সে মায়ের সেই কথাগুলো অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলো।

বনহুর নিজের জীবনকে বিপন্ন করে বিশ্বের মানুষের জন্য আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত সর্বক্ষণ, শুধু তার ভরসা আল্লাহ।

*

কান্দাই ফিরে বনহুর প্রথমেই চৌধুরীবাড়িতে গেলে মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

বহুদিন পর বনহুর এ বাড়িতে এলো।

বাড়ির ফটকে প্রবেশ করতেই দারোয়ান সালাম দিয়ে সরে দাঁড়ালো। কেমন একটা থমথমে ভাব তার চোখেমুখে। বনহুর অবাক হলো, কারণ বৃদ্ধ দারোয়ান তাকে ভালভাবেই চেনে। অথচ তাকে দেখে মুখ নিচু করে রইলো, কেমন যেন দ্বিধা লাগলে বনহুরের মনে। সে দ্রুত অন্তপুরে প্রবেশ করতেই সরকার সাহেব এগিয়ে এলেন, তিনি চশমাটা উঁচু করে ধরে ভালভাবে বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন-কে মনি! বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর।

বনহুর আরও অবাক হলো সরকার সাহেবের কম্পিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ শুনে বললো সে-সরকার চাচা কি হয়েছে? তোমরা ভাল আছো তো?

সরকার সাহেব হাতের পিঠে চোখ মুছে বললেন-বেগম সাহেবা আর নেই তিনি কয়েকদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন।

বনহুরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো চারপাশে, বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তার মুখে কোনো কথা নেই। অধর দংশন করছিলো সে, সুন্দর মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পড়লো একটা গভীর শোকের ছায়া। ছোট্ট শিশুর মত ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু সে নিজেকে কঠিনভাবে সংযত করে রাখলো।

মনিরা এবং অন্য সবাই এসে দাঁড়ালো সেখানে।

মনিরার চোখে অশ্রুবন্যা বইছে।

তবুও সে নীরব। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে। কঠিন পাথরের মূর্তির মত দেখাচ্ছে তাকে। মনিরা ভেবেছিলো সংবাদটা শোনার পর বনহুর ছোট্ট বালকের মত উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে আকুল হবে কিন্তু আশ্চর্য, স্বামীকে সে অসীম ধৈর্যের প্রতীক দেখতে পাচ্ছে।

বনহুর বসে পড়লো ধপ্ করে একটি সোফায়। সরকার সাহেবও এগিয়ে এসে বনহুরের পাশে বসলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন ওর মনে ঝড় বইছে। প্রচন্ড ব্যথা সে সহ্য করে যাচ্ছে কঠিনভাবে। সরকার সাহেব বললেন-বেগম সাহেবা হঠাৎ এমনভাবে চলে যাবেন আমরা ভাবতে পারিনি।

সরকার সাহেবের কথা শেষ হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তে কান্দাই পুলিশ অধিনায়ক মিঃ কিবরিয়া কয়েকজন পুলিশ অফিসারসহ উদ্যত রিভলভার হাতে হলঘরে প্রবেশ করলেন।

বাইরে কয়েকজন পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশবাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে বাড়িটির চারপাশে।

পুলিশ অধিনায়ক ও তার দলবল হলঘরে প্রবেশ করে বনহুরকে ঘিরে ধরলো। সরকার সাহেব এবং মনিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

বনহুর চোখ তুলে তাকালো মিঃ কিবরিয়ার হাতের উদ্যত রিভলভারের দিকে।

মিঃ কিবরিয়া বললেন-একটুও নড়তে চেষ্টা করবে না, করলেই আমি গুলী ছুড়বো।

ততক্ষণে আরও কয়েকজন পুলিশ উদ্যত রাইফেল হাতে বনহুরের চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো।

বনহুর তাকালো সরকার সাহেব ও মনিরার মুখের দিকে, তারপর হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিলো মিঃ কিবরিয়ার সামনে।

মনিরা ছুটে এলো–না, না, আপনারা এভাবে ওকে আজ গ্রেফতার করবেন না। ওর মা মারা গেছেন.....কান্নায় ভেঙে পড়লো মনিরা।

মিঃ কিবরিয়া বললেন-মিসেস চৌধুরী, আমরা এ সংবাদ জানি আর সেজন্যই আমরা লক্ষ্য রেখেছিলাম। আমরা জানতাম, দস্যু বনহুর যেখানেই থাক মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সে চলে আসবে। আমাদের ধারণা সত্য হলো।

আপনারা এত নির্দয় হতে পারবেন? কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো মনিরা।

মিঃ কিবরিয়া বললেন-মিসেস চৌধুরী, আপনার স্বামী তার চেয়েও নির্দয়, নিষ্ঠুর, কারণ সে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তা শুধু মানবসমাজের ক্ষতি সাধন করছে না, এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তাতে সমস্ত পুলিশ বিভাগের অক্ষমতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

মনিরা বলে উঠলো–আপনারা ভুল বলছেন। আমার স্বামী কোনো অন্যায় করেনি, যা করেছে তা দেশের মঙ্গলের জন্যই করেছে। আপনারা ওর প্রতি এমন নির্মম হবেন না, কারণ সে মাতৃশোকে বিহ্বল, বড় কাতর হয়ে পড়েছে.....

মনিরা, ওর কর্তব্য ওকে পালন করতে দাও। মা নেই, থাকলে দুঃখ পেতেন। সেই দুঃখ আমার কাছে বড় বেদনাদায়ক হতো। আমি এখন নিশ্চিন্ত। চলুন মিঃ কিবরিয়া...বনহুর হাত দু'খানা তুলে ধরলো।

মিঃ কিবরিয়া বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় গাড়িতে তুলে নিলেন দস্যু বনহুরকে।

মিঃ কিবরিয়া ওয়্যারলেসে কান্দাই বিমান বন্দরের গোয়েন্দা বিভাগ প্রধানকে জানিয়ে দিলেন, তারা কৃতকার্য হয়েছেন।

আগে থেকে রিজার্ভ বিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো। কান্দাই পুলিশ বাহিনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। পুলিশমহল অতি সতর্কতার সঙ্গে মানচিত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়েছিলো, বনহুর যখন তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পাবে তখন সে যেখানেই থাক না কেন চলে আসবে চৌধুরীবাড়িতে। পুলিশ বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে যেন বনহুর পালাতে পারে, এ কারণেই তৈরি করা হয়েছিলো এই পরিকল্পনা। কান্দাইর হাঙ্গেরী কারাগার তাকে আটকে রাখতে পারেনি কোনোদিন। এজন্য এবার গোয়েন্দা বিভাগ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছে। পুলিশমহল জানে, নূরুজ্জামান এ ব্যাপারে জানতে পারলে সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই সবকিছু সবার অজ্ঞাতে অতি সর্তকতার সঙ্গে চলছিলো। বনহুরকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মিসরের এক গোপন স্থানে আটক করে রাখা হবে। আর সে কারণে কান্দাই বিমান বন্দরে একটি গোয়েন্দা বিমান অপেক্ষা করছিলো।

মিঃ কিবরিয়া বনহুরকে গ্রেফতার করে মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাকে পুলিশ ভ্যান পরিবেষ্টিত অবস্থায় গাড়িতে তুলে নিলেন এবং গাড়িতে বসেই তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টরকে জানিয়ে দিলেন, ওয়্যারলেসে বিমান বন্দরে সংবাদটা জানিয়ে বিমান প্রস্তুত রাখতে বললেন। বনহুরকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান বিমানবন্দরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে বিমান মিসর পিরামিডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে।

বনহুরকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানগুলো যখন কান্দাই নগরীর পথ বেয়ে ছুটে চলেছে তখনও কেউ জানে না বনহুর গ্রেফতার হয়েছে এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে বিমান বন্দরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ কিবরিয়া বনহুরকে আটক করে যখন চৌধুরীবাড়ির ফটক পেরিয়ে গেলেন তখন মনিরা ছুটে গিয়ে নূরের কাছে টেলিটফোন করলো, নূর, তুমি শীঘ্র

চলে এসো, একটি দুঃসংবাদ আছে....বেশি...

নূর দাদীমার শোকে বিহ্বল ছিলো। একদিন মায়ের কাছে ঐ বাড়িতেই ছিলো সে। দাদীমার মৃত্যু তাদের পরিবারে একটা দারুণ শোকের ছায়া ফেলেছিলো। সমস্ত বাড়িখানা থমথম করছিলো। সর্বদা মায়ের চোখে পানি নূরের মনকে বিচলিত করে তুলছিলনা, তাই দু'একদিনের জন্য নূর ফিরে এসেছিলো বাংলোয় এবং আরমানের সাথে নানা আলাপ আলোচনায় দাদীমার শোককে কিছুক্ষণ ভুলে থাকার চেষ্টা করছিলো। এমন সময় বয় এসে বললো–স্যার, আপনার টেলিফোন....

নূর ঐ মুহূর্তে বারান্দায় বসে আরমানের সঙ্গে দাদীর মৃত্যু নিয়েই কথাবার্তা বলছিলো। বিশেষ করে মা দাদীমার মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। এ বাড়িতে আসার পর থেকে তার মা কোন সময় শাশুড়ীর স্নেহের বন্ধন থেকে দূরে সরে যাননি। মা ছিলেন দাদীমার আদরিণী পুত্রবধূ। এসব নিয়েই আলোচনা হচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন এলো।

নূর বললো.....এসো আরমান ঘরে যাই। দেখি কার টেলিফোন।

আরমান বললো–চলো। বাইরে অনেকক্ষণ বসলাম। হয়তো পুলিশ অফিসের ফোন হবে।

নূর ও আরমান উঠে ভেতরে চলে যায়।

নূর রিসিভার হাতে তুলে নিয়েই শুনতে পায় মায়ের গলা।

নূর দুঃসংবাদ, এক্ষুণি চলে এসো....মনিরার কণ্ঠ ধরে আসে।

নূর বুঝতে পারে, বিচলিত হয় সে। কদিন পূর্বে মা এমনি করেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে ফোনে বলেছিলেন, নূর শীঘ্র চলে এসো, তোমার দাদীমার অবস্থা ভাল নয়। তবে কি আজ আবার নতুন কোনো বিপদ এলো। অনেক কথাই জোট পাকিয়ে ভিড় জমালো তার মনে। আবার শোনা গেলো মায়ের গলা, কম্পিত সে কণ্ঠস্বরতোমার আব্বু এসেছিলেন মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে.....কিন্তু তিনি হলঘরে পৌঁছতেই তাকে পুলিশ বাহিনী আচম্বিতে গ্রেফতার করে মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিয়ে গেছে।

……আব্বু এসেছিলেন…..

…..হাঁ, কিন্তু তার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি পুলিশ বাহিনী আগে হতেই এ বাড়ির ওপর গোপন নজর রেখেছিলো, তাই সহজেই তাকে গ্রেফতার করতে পেরেছিলো…..মিঃ কিবরিয়া স্বয়ং এসেছিলেন….

নূর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। ভাষা যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। মনিরার গলা আবার শোনা যায়…..নূর দেরী করোনা, তুমি শীঘ্র চলে এসো……

ধীরে ধীরে রিসিভার রেখে দিলো নূর।

আরমান উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার নূর?

আরমানের উদ্বিগ্নতার কারণ ছিলো-বন্ধু নূরের মুখোভাব তাকে বেশ ভাবিয়ে তুললো। দাদীমার মৃত্যুর ব্যাপারে কদিন অত্যন্ত শোকার্ত ছিলো তারা সবাই। তবে কি নতুন কোনো বিপদ ঘটলো? অবশ্য ফোনে নূরের আব্বু এসেছিলেন' কথাটা শুনে কিছুটা আঁচ করে নিতে পেরেছে আরমান, তবে কি এমন ঘটলো?

নূরের মুখোভাব বিষণ্ন দেখালে আরমান ভীষণ ঘাবড়ে যায়। ওর মঙ্গলের জন্য সে সবকিছু করতে পারে। নূর যখন বললো আব্বু এসেছিলেন, তারপর কোনো কথা সে বললো না, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, ব্যাপার যে গুরুতর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আরমানের প্রশ্নে নূর তাকালো তার মুখের দিকে। তারপর একটা সোফায় বসে পড়ে বললো–আরমান, একটা কথা তোকে বলবো বলবো করেও বলা হয়নি। আমার বন্ধু হিসেবে তুই সবচেয়ে প্রিয়। তোর কাছে কোনো কথা গোপন করা আমার মোটেই উচিত নয়।

নূরের দুঃখভরা কণ্ঠস্বরে ব্যথিত হলো আরমান। নূর যে কথা বলতে চেয়েও বলেনি এতদিন, তা সবই আরমান জেনে ফেলেছে। জানলেও সে তা প্রকাশ করেনি নূরের কাছে। নূর যদি কোনোদিন নিজে বলে তাহলে আরমান তখন বলবে সবকিছু যা সে জেনেছে। কি বলতে চায় নূর, কিছুটা আঁচ করে নেয় আরমান।

গভীর দুঃখ আর ব্যথাভরা দৃষ্টি নিয়ে আরমানের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, তারপর শান্ত-স্থির কণ্ঠে বললো—আমার মুখে এমন একটা কথা শুনবি আরমান যা তুই কোনোদিন ভাবিনি। তবু তোকে না বলে পারছি না বন্ধু.....

আমি জানি কি বলতে চাও তুমি। নূর, তুমি না বললেও আমি জানি। যাকে নিয়ে তুমি নিজেকে সংকুচিত মনে করছে তিনি যে বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধার জন, তিনি যে সবার গর্বের জন। অসহায় নির্যাতিত মানুষের বন্ধু.....

আরমান!

হ্যাঁ, আমি জানতাম। তাকে দেখার জন্য আমার বাসনা ছিলো। সে সাধ আমার পূর্ণ হয়েছে। মনে পড়ে আমি আর তুমি একদিন বাগানে বসে গল্প করছিলাম তখন এক ভদ্রলোক এলেন, তুমি পরিচয় করিয়ে দিলে শুধু একতরফা। আমার পরিচয় দিলে তাকে কিন্তু তার কোনো পরিচয় করিয়ে দিলে না। আমি কিন্তু চমকে উঠেছিলাম সেদিন তোমার চেহারার সঙ্গে তার চেহারার হুবহু মিল দেখে। তারপর অনেকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু তেমন করে আর পরিচয় হয়নি। তুমিও তার ব্যাপারে আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে, তখন আমার মনে একটা জানার বাসনা উঁকি দিলো। গোপনে সন্ধান নিয়ে জানলাম তিনি তোমার আব্বা এবং আমাদের প্রিয় দস্যু-বনহুর।

আরমান তুই.....

প্রথম দিন তাকে দেখেই আমি মুগ্ধ, অভিভূত হই, কারণ তার চেহারার মধ্যে আমি যাকে দেখলাম তিনি সাধারণ মানুষ নন।

তার অসাধারণ দীপ্ত চেহারা আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিলো। তখনই বুঝেছি উনি তোর আব্বু স্বয়ং দস্যু বনহুর।

নূর আবেগে জড়িয়ে ধরলো আরমানকে। এতদিন একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাকে ভীষণ বিড়ম্বিত করেছিলো। তার প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু আরমান যেদিন জানবে তারই পিতা স্বয়ং দস্যু বনহুর তখন তার মুখ কোথায় থাকবে। সে একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ হিসেবে ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। অথচ তারই পিতা স্বয়ং দস্যু বনহুর

আরমানকে বুকে জড়িয়ে ধরে নূর অনাবিল একটা শান্তি হৃদয়ে অনুভব করলো। আরমান তাহলে সব জানে আর জেনেও সে কোনোদিন প্রশ্ন করেনি। তার মুখোভাবে কোনো বিরূপ আভাস পাওয়া যায়নি।

বললো নূর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরমান, আমার আব্বু স্বয়ং দস্যু বনহুর। এ কথা তুই জানিস্ আর জেনেও কোনোদিন আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিসনি, আরমান। তুই.....

বলো? বলো কি বলতে চাও?

আমি জানি সবাই তাকে ভিন্ন চোখে দেখে। পুলিশের চোখে তিনি দোষী। আইন তাকে ক্ষমা করবে না, করতে পারে না। যে কারণে আব্বু আজ এরেষ্ট হয়েছেন।

আরমান বলে উঠলো তোমার আব্বু.....

হ্যাঁ আরমান। আমার দাদীমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে আব্বু এসেছিলেন কিন্তু তাকে এক মুহূর্ত বাড়িতে অপেক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। কান্দাই পুলিশ সুপার তাঁকে গ্রেফতার করেছে এবং তাকে মিসর কারাগারের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে নিয়ে গেছে। আরমান, শুনেছি মিসরে কোনো এক পিরামিডের অভ্যন্তরে এক নতুন উপায়ে কারাগার তৈরি করা হয়েছে শুধু আমার আব্বুকে সেখানে আটকে রাখার জন্য। ঐ কারাগার থেকে কারও সাধ্য নেই বেরিয়ে আসার। শুধু আব্বুর জন্যই এ কারাগার তৈরি হয়েছে আরমান, শুধু আব্বুকে আটকে রাখার জন্য।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো আরমান–বলো কি নূর, এ সংবাদ তুমি জানতে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো নূর, বললো–আরমান, আমি আগে থেকেই সব জানতাম দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য কান্দাই সরকার নিপুণ একটা গোপন কৌশল অবলম্বন করছে এবং মিসর সরকার কান্দাই সরকারকে সহযোগিতা করছে-এ ব্যাপারে একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে উভয় দেশের মধ্যে।

এত জেনেও তুমি নিশ্চুপ ছিলে নূর?

কোনো উপায় ছিলো না, তবে আল্লু কান্দাই আসবেন এটা যদি জানতে পারতাম তাহলে উপায় খুঁজে পেতাম আরমান। আমি বিফল হয়েছি। কোন মুখে যাবো মায়ের সামনে। মাথাটা নিচু করলো নূর।

আরমান নূরের পিঠে হাত রেখে বললো–কিছু ভেবো না নূর। চলো তোমার মা ডেকেছেন, ওখানে গেলেই সব বোঝা যাবে।

আরমান আর নূর চৌধুরীবাড়ির পথে রওয়ানা দিলো।

*

বিমানখানা একটু নতুন ধরনের। কতটা জন্তুর মত; কিন্তু ডানা আছে। মিসরীয় বিমান। বিমানের গায়ে লেখা আছে এম এম আর-সংক্ষিপ্ত তিনটি অক্ষর। বৃহৎ অজগরের চক্ষুর ন্যায় দুটি চোখ, এবং চাকাগুলো জন্তুর পায়ের মত থ্যাবড়া। বিচিত্র ধরনের এ বিমানখানা যখন মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো, তখন পৃথিবীর মানুষ জানে না ঐ বিমানে কে বা কারা আছে। জানে না স্বয়ং দস্যু বনহুরকে বন্দী করে এ বিমানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জানলে কান্দাইবাসী অনেকের চোখেই অশ্রু ঝরতো।

বিমানখানা যখন কান্দাই পর্বতমালা অতিক্রম করছিলো তখন বনহুর তার হাতের আংটির নিকটে মুখ নিয়ে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে আস্তানায় রহমান শুনতে পেলো সর্দারের সংকেতধ্বনি। তৎক্ষণাৎ গিয়ে দাঁড়ালো দরবারে ক্যামেরার সম্মুখে। ক্যামেরার সুইচ টিপতেই সমস্ত দৃশ্য পর্দায় পরিষ্কার ফুটে উঠলো।

কান্দাই পবর্তমালার ওপর দিয়ে বিমানখানা উড়ে যাচ্ছে তাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রহমান আস্তানায় বসে। বিমানখানা অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। দেখলে মনে হয় একটা জন্তু আকাশপথে উড়ে যাচ্ছে। বিমানটির দুপাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে থোকা থোকা মেঘ-কোনো স্তর কালো কোনো স্তর সাদা ধবধবে। বনহুর বিমানের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে, তার হাতকড়া থাকায় সে নিশ্চুপ বসে আছে শান্ত ছেলের মত।

মিঃ কিবরিয়ার হাতে রিভলভার।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন কান্দাই পুলিশ সুপার–তোমায় বড় শান্ত লাগছে। এভাবে তোমাকে গ্রেফতারে সক্ষম হবো এটা কিন্তু আমাদের চরম সৌভাগ্য। কি বলো, তাই না।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে ভাবছিলো তার মায়ের কথা। আর কোনোদিন সে স্নেহময়ী জননীকে দেখতে পাবে না। তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না। সেই মায়াভরা দুটো চোখ, তার চোখের সম্মুখে ভাসছিলো মায়ের মুখখানা, বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠছিলো, কতদিন তিনি বলেছেন, মনি এবার ফিরে আয় বাবা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারী হ'...বাবা, আমার কেমন যেন ভয় করে কখন কোন বিপদ এসে তোকে গ্রাস করবে আমাকে ছুঁয়ে শপথ কর মনির, আর যাবি না। হেসে বলতো বনহুর, মা তোমার ছেলে ছোট্ট শিশু নয়। ভয় কি মা, আমি তো কোনো অন্যায় করি নাঃ....যারা অন্যায় করে আমি তাদের শায়েস্তা করি.....

মিঃ কিবরিয়ার কথায় বনহুর চোখ ফিরিয়ে তাকালো, কোনো জবাব দিলো না।

রহমান তাদের আস্তানায় বসে সব জানতে পারলো। কান্দাই পর্বতমালার ওপর দিয়ে বিমানখানা সোজা চলে গেলো পূর্বদিক পানে। কায়েস এবং আরও কয়েকজন অনুচর দন্ডায়মান ছিলো, তারাও সব দেখছিলো। তারা ভাবতেও পারেনি তাদের সর্দার এভাবে গ্রেফতার হবে। অত্যন্ত চিন্তিত হলো রহমান, কারণ সে জানে ক'দিন পূর্বে সর্দারের জননী মরিয়ম বেগম ইন্তেকাল করেছেন। এ সংবাদ সর্দারকে পৌঁছাতে পারেনি সে, এ জন্য রহমানের বড় আফসোস ছিলো। সে ক'দিন থেকে প্রতীক্ষা করছিলো সর্দার আরাকান থেকে ফিরে প্রথমে আস্তানায় আসবে কিন্তু তা সে আসেনি। হয়তো তার মনের টানে অথবা মনের অস্থিরতার জন্য প্রথমেই সে চৌধুরীবাড়িতে গিয়েছিলো, সেই সময় কান্দাই পুলিশমহল তাকে গ্রেফতার করেছে। অনেক কথা ছিলো সর্দারের সঙ্গে, যা অত্যন্ত গোপনীয়। এক অসৎ ব্যবসায়ী ধনকুবের পুলিশমহলকে ধোকা দিয়ে তাদের ভুলপথে ব্যবহার করছে। সাধুতার মুখোশধারী এই ব্যক্তির নামও রহমান সংগ্রহ করেছে। বাহাদুর সিং গডসে। তার আসল বাড়ি বা দেশ কান্দাই নয়। বাহাদুর সিং-এর দেশ কোথায় কেউ জানে না। সুদীর্ঘকাল ধরে কান্দাইয়ে অবস্থান করছে সে, ভেতরে ভেতরে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং ব্যবসা বিস্তার করেছে। অত্যন্ত চতুর বাহাদুর সিং-এর অবাধ আনাগোনা পুলিশমহলে। মিরান নামে তার এক সহকারী তাকে সর্বদা সহায়তা করে থাকে। আর আছে বেতনভুক্ত কর্মচারী। কান্দাইয়ে তার বাসভবনেই অফিস এবং ঝাম শহরে আরও একটি অফিস আছে। কান্দাই সাগরে তার একটি জাহাজ আছে। এ জাহাজের নাম ঈগল। ঈগলের মত বৃহৎ জাহাজ কমই নজরে পড়ে। এহেন জাহাজের মালিক বাহাদুর সিং গডসে।

প্রতি অমাবস্যায় জাহাজ ঈগল কান্দাই বন্দর ত্যাগ করে। এ জাহাজে কান্দাই শহর থেকে মালামাল দেশের বাইরে যায়, এ খবর তেমন করে না জানলেও অনেকেই জানে, ঈগলের অভ্যন্তরে এমন কোনো বস্তু দেশের বাইরে পাচার হয় যা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, পুলিশমহলও জানে না। সবাই জানে ঈগল কান্দাই হতে পেট্রোল বহন করে বিদেশে যায়, ফিরে আসে খালি ড্রাম নিয়ে। মাসাধিককাল কান্দাই বন্দরে অবস্থান করার পর ঈগলের খালি খোলস ভর্তি হয় ড্রাম নিয়ে। তারপর নির্দিষ্ট তারিখে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে। ধনকুবের স্বদেশের মাটি কোনো কারণে ত্যাগ করে কান্দাইকে বেছে নিয়েছিলো তার ব্যবসার যোগ্য স্থান হিসেবে। যদিও সে জানতো দস্যু বনহুরের নিপুণ দৃষ্টি থেকে তার উদ্ধার নেই, জানতো তাকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হবে এবং ব্যবসা চালাতে হবে। তবুও সে বেছে নিয়েছিলো কান্দাই নগরীকে।

ব্যবসার শুরুতেই নগরীর স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নিয়ে নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন করলো বাহাদুর সিং। খানাপিনা আর নাচগান সবই চললো সে সব উৎসবে। বিরাট অট্টালিকার অভ্যন্তরে চললো বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ। এ বাড়িখানা কিছুটা রহস্যজনকভাবে তৈরি। অনেকগুলো চোরাকুঠরী রয়েছে তার মধ্যে, রয়েছে গুমঘর। এ ঘরের সন্ধান কেউ জানে না, কান্দাইয়ের মিস্ত্রী দ্বারা এ শুমঘর তৈরি করা হয়নি। মিসর থেকে কিছু দক্ষ কুশলী মিস্ত্রী আনা হয়েছিলো, তারাই অল্পদিনের মধ্যে এ বাড়ি তৈরি করে এবং তারাই তৈরি করে গুমঘরও। যে ঘরের সন্ধান জানে না কান্দাইবাসী। ভয়ংকর বিভীষিকাময় এ কক্ষ, যার তলদেশে তৈরি হয়েছে একটি সুরঙ্গপথ। অদ্ভুত আর ভয়ংকর এ সুরঙ্গপথ। কোথায় কত দূর চলে গেছে তা কে জানে। সুদীর্ঘ সময় আত্মগোপন করে বাহাদুর সিং গডসে এ বাড়ির তলদেশে তৈরি করেছে এ রহস্যময় সুরঙ্গপথ। একটি মোটরগাড়ি অথবা ঐ ধরনের যান অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাধুতার মুখোশ পরে একদিন আত্মপ্রকাশ করলো বাহাদুর সিং গডসে। স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নিয়ে চললো তার কারবার। এমন কি পুলিশমহলকেও বশ করতে তার বিলম্ব হলো না।

পুলিশমহল জানলো এমন এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে অবহেলা করা যায় না। পুলিশমহল সর্বতোভাবে তার সাহায্য পেয়ে আসতে লাগলো। যে কোনো ব্যাপারে পুলিশমহলের সমস্যা সমাধান করতে বাহাদুর সিং পিছপা নয়। শুধু পুলিশমহল

নয়, কান্দাইবাসীর যদি কোনো অসুবিধা দেখা দেয় তা দূর করার জন্য সবার আগে এগিয়ে আসে বাহাদুর সিং গডসে। অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে গডসে সাহায্য করে শহরবাসীকে। মুখোসের অন্তরালে একটি বিষধর সাপ সে।

সুযোগ বুঝে গডসে পুলিশপ্রধানের সঙ্গে পরামর্শ করলো, দস্যু বনহুরকে খতম করতে হবে, তাহলেই কান্দাই নগরীতে ফিরে আসবে অনাবিল শান্তি। বনহুরকে সরাতে না পারলে কোনোদিনই এ আতঙ্ক যাবে না। জনগণও যেন জানতে না পারে পুলিশমহলের এ উদ্যোগের কথা। মিঃ কিবরিয়ার দু চোখে নতুন এক উন্মাদনা জাগলো। হঠাৎ করে একটা সংবাদ শুনলেন, চৌধুরীবাড়ির গৃহকর্ত্রী মরিয়ম বেগম ইন্তেকাল করেছেন। খবরটা শোনার পর মিঃ কিবরিয়ার মাথায় নতুন এক বুদ্ধি এসেছিলো। তিনি তৎক্ষণাৎ ফোন করে মিঃ গডসের উপস্থিতি কামনা করলেন।

গডসে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ অফিসে হাজির হলো। মিঃ কিবরিয়া অফিসে কাজ করছিলেন এবং গডসের প্রতীক্ষা করছিলেন। গডসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বসালেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত সলা-পরামর্শ করলেন। উভয়ের চোখেমুখে। আনন্দের উচ্ছ্বাস। একসময় মিঃ কিবরিয়া হতাশ কণ্ঠে বললেন-আমাদের প্রচেষ্টা হয়তো সার্থক হবে কিন্তু এ মহানায়ককে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন। হাঙ্গেরী কারাগারও তাকে আটক রাখতে পারেনি। কোনো শক্তিই বনহুরকে কাবু করতে পারেনি। মাতৃশোকে কাতর বনহুর যখন চৌধুরীবাড়িতে আসবে তখন আমার শসস্ত্র পুলিশবাহিনী হয়তো কৌশলে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থও হতে পারে।

পুলিশ প্রধানের এ কথায় মিঃ গডসের চোখেমুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো, বললো সে-মিঃ কিবরিয়া, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো।

হতাশার হাসি হাসলেন মিঃ কিবরিয়া-মিঃ গডসে, আপনি যা মনে করছেন তা নয়। তাকে আয়ত্তে আনা বড় শক্ত।

মিঃ গডসে চাপাকণ্ঠে বললো–আমি জানি বনহুর শুধু কান্দাই নয়, সমস্ত বিশ্বে আতংক সৃষ্টি করেছে। তাকে আয়ত্তে আনতে না পারলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে। এ ব্যাপারে আমি বহুদিন যাবৎ ভাবছি। শুধু ভেবেই ক্ষান্ত হইনি মিঃ কিবরিয়া, এর সুব্যবস্থা করেই আমি কান্দাই নগরীতে পদার্পণ করেছি।

মিঃ কিবরিয়া দু'হাতে মিঃ গডসের হাত চেপে ধরলেন এবং আনন্দভরা গলায় বললেন-আপনি যা বললেন তা কি সত্য?

হ্যাঁ, সত্য। শুধু দস্যু বনহুর নয়, তার মত আরও দশজন শক্তিশালী দস্যুকেও আয়ত্তে আনা সহজ হবে। মিসরের এক পিরামিডের অভ্যন্তরে

এর বেশি নূর জানতে পারেনি। কৌশলে নূর একটি টেপ রেখে এসেছিলো পুলিশ সুপার মিঃ কিবরিয়ার অফিসের ড্রয়ারের ফাইলের নিচে। নূর জানতো, মাঝে মাঝে ঐ ব্যক্তি পুলিশ অফিসে আসে যাকে দেখলে নূরের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ঐ লোকটি তার মোটেই পছন্দনীয় নয়। তার প্রশংসায় যখন পুলিশমহল পঞ্চমুখ তখন নূর কেন যেন বরদাস্ত করতে পারে না তাকে। একদিন সে জানতে পারলো গডসে পুলিশমহলের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে গোপন শলা পরামর্শ চালাচ্ছে।

এ সন্দেহ অহেতুক কিনা পরীক্ষা করার জন্য নূর মিঃ কিবরিয়ার অফিসকক্ষের টেবিলের ড্রয়ারে টেপরেকর্ড রেখে যায়। এবং একসময় তা সরিয়ে নেয়। মিঃ কিবরিয়া নূরকে তার কর্মদক্ষতার জন্য স্নেহ করতেন। আর সে কারণেই পুলিশ সুপার কক্ষে তার প্রবেশে কোনো অনুমতির প্রয়োজন হতো না। নূর অনায়াসে টেপটি কোটের পকেটে তুলে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। সবার অলক্ষে গভীর রাতে যখন বয়-বাবুর্চি ঘুমিয়ে ছিলো তখন নূর এই টেপ চালু করে সব জানতে পারলো। মিঃ গডসে আর পুলিশ সুপার মিঃ কিবরিয়ার মধ্যে যে গোপন আলোচনা হলো তা টেপ গ্রহণ করেছিলো, তবে হঠাৎ মাঝামাঝি গিয়ে ক্ষুদে টেপরেকর্ডটি অকেজো হয়ে পড়েছিলো। নূর যতটুকু জানতে পারলো তাই তার জন্য যথেষ্ট মনে করলো এবং এ ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলো। তার প্রিয় বন্ধু আরমানের কাছে সব কথা বলা চললেও এ টেপূরেকর্ডের অভ্যন্তরে যে কথাগুলো ধরা আছে তা তার কাছে বলা বা শোনানো যায় না। তাই নূর শরণাপন্ন হয়েছিলো রহমানের।

নূর তার নিজ গাড়ি নিয়ে কান্দাই জঙ্গলে গিয়ে কৌশলে সাক্ষাৎ করেছিলো রহমানের সঙ্গে এবং ঐ টেপরেকর্ডের বক্তব্যগুলো তাকে শুনিয়েছিলো। রহমান তখনই সন্দেহ করেছিলো ঐ ধনকুবের বাহাদুর সিং গডসে শুধু স্বনামধন্য ব্যক্তিই নয়, সে একজন অসৎ ব্যবসায়ী। তার সুউচ্চ ইমারত সাধারণ বাসস্থান নয়, এ ইমারতের অভ্যন্তরে গভীর কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। লোকটি কান্দাই

নগরীতে ব্যবসায়ী নামে পরিচিত, আরও একটি পরিচয় তার আছে তা হলো জনসেবক দয়ালু দাতা মিঃ গডসে।

এ টেপরেকর্ড শোনার পর রহমান সতর্ক ছিলো, সর্দার দেশে ফিরে এলেই তাকে সতর্ক করে দেবে কিন্তু সে সুযোগ তার হলো না। সর্দারকে কৌশলে পুলিশবাহিনী গ্রেফতার করলো।

মিঃ গডসের চক্রান্ত সফল হলো।

বন্দী হলো বনহুর।

ঐ দিন মিঃ গডসের বাড়িতে বিরাট জলসা বসলো।

খানাপিনা নাচ-গান চললো।

নূর এক ধনী ব্যবসায়ীর বেশে হাজির হলো জলসায়। তাকে সাহায্য করলো আরমান। মিঃ গডসের বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে নূর ও আরমান গিয়েছিলো মায়ের কাছে।

আরমান গাড়িতে বসেছিলো।

নূর মায়ের সংগে সাক্ষাৎ করেছিলো অন্তপুরে গিয়ে। সব শুনেছিলো সে মায়ের মুখে। তারপর ফিরে এসেছিলো গাড়িতে।

উৎসবে যোগ দেওয়ার পূর্বে নূর নিজেকে দাড়ি-গোঁফে এবং মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করে নিয়েছিলো, চোখে তার কালো চশমা। অসংখ্য নোটর গডসের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। নূরও এসেছে আরমানকে সঙ্গে করে, তার গাড়িখানা একপাশে রাখলো নূর। ড্রাইভার সে ইচ্ছা করেই নেয়নি। তার ছদ্মবেশ শুধু তারাই জানে, তৃতীয় ব্যক্তিকে জানাতে চায় না তারা।

বিরাট হলঘর।

একপাশে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেছে বাদ্যকরগণ। একপাশে সারিবদ্ধ সোফায় বসেছেন স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ। সকলের মধ্যে রয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তাগণ।

আরমান একপাশে গিয়ে বসলো।

বসবার পূর্বে করমর্দন করলো গডসের সঙ্গে।

শুরু হলো আনন্দ উৎসব।

মাঝে মাঝে নৃত্য-গান, তারপর এক একজন বক্তৃতা বা বক্তব্য রাখছেন। প্রথমেই বললেন মিঃ বার্ড স্মিথ, তিনি নতুন এসেছেন কান্দাই শহরে, পুলিশপ্রধান হয়ে। অবশ্য মিঃ কিবরিয়ার সমকক্ষ পদেই তিনি বহাল রয়েছেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন-আজকের উৎসবের শুরুতেই আমি বড় আনন্দ লাভ করেছি কারণ যার ভয়ংকর উপস্থিতির আতঙ্কে আমরা আতঙ্কিত ছিলাম, কান্দাই পুলিশমহল তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজকের এ উৎসব সে কারণেই। প্রথমেই আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি মিঃ বাহাদুর সিংকে।

করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো হলঘরটি।

মিঃ গডসে এবার উঠে দাঁড়ালো, তার মুখমন্ডলে একটা ইংগিতপূর্ণ হাসি ফুটে উঠলো, বললো–আমার খুশি আমার নিজের জন্য নয়। আমি কান্দাইবাসীর মঙ্গল চাই। আর সে মঙ্গলার্থেই আমার চেষ্টা সার্থক করতে যারা সহায়তা করেছেন তাদের খুশির জন্য আজকের এ উৎসব।

গডসের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় করতালি পড়লো।

শুরু হলো মিউজিক আর নৃত্য।

কয়েকজন নাচ শুরু করলো। বলড্যান্স আর উকট অঙ্গভঙ্গি। গডসের পাশের আসনে এক মহিলা বসেছিলেন, তিনি তার স্বামী অথবা বন্ধুর হাত ধরে উঠে পড়লেন নাচবেন বলে।

নূর ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ শূন্য আসনে বসলো। তার সতর্ক দৃষ্টি এবং কান সজাগ রইলো।

নূর ক্ষুদে টেপরেকর্ডটি অত্যন্ত যত্নসহকারে চালু অবস্থায় পকেটে রেখেছিলো। অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি কথা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। কোন মুহূর্তে কে কি কথা বলছে তা গৃহীত হচ্ছে নূরের পকেটে।

উৎসব যখন জমে উঠেছে তখন নূর হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলো। তার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নূর ঢলে পড়লো।

আরমান লক্ষ করছিলো নূরকে।

তাড়াতাড়ি উঠে এলো সে নূরের পাশে।

ততক্ষণে উৎসব মঞ্চের গান-বাজনা থেমে গেছে।

আরমান নূরের পাশে এসে দাঁড়াবার পূর্বেই তাকে গর্ডসে ধরে ফেলেছে। আরও দুজন লোকের সহায়তায় পাশের একটি শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হলো তাকে।

চিন্তিত বিষণ্ন মনে আরমান বন্ধুর শিয়রে দন্ডায়মান রইলো।

উৎসব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনায় আরমান বললো—আমি জানতাম আমার বন্ধুবরের একটা অসুখ আছে, মাঝেমধ্যে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তখন তাকে দেশের বাইরে কোথাও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

গডসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছিলো, কারণ তার উৎসব পন্ড হবার উপক্রম, তাই পাশে একটি নির্জনকক্ষে তাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। আরমান তার কাছে রইলো।

অবশ্য গডসে ডাক্তার আনার জন্য টেলিফোন করতে যাচ্ছিলো। বাধা দিলো আরমান, ভয়ের কোনো কারণ নেই কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে মিঃ রশিদ হাওলাদারের।

এখানে নূর নিজের পরিচয় রশিদ হাওলাদার বলেই দিয়েছিলো। বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করার ইচ্ছা আরমানের ছিলো না, কারণ কখন কোন মুহূর্তে নূরের এবং তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যায়।

ওদিকে যখন মিঃ গডসে তার আমন্ত্রিত অতিথিগণকে নিয়ে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে রয়েছে ঠিক সেই সময় আরমান আর নূর নির্জন একটি কক্ষে অবস্থান করছে। মিঃ গডসে নূরকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করতেই নূর চোখ মেলে তাকালো, চাপা গলায় বললো–আরমান, তুমি ঠিকমতই কথা বলেছে।

নূর, তুমি সজ্ঞানে আছো তাহলে আমি মনে করেছি তুমি সত্যই জ্ঞান হারিয়েছে।

না, এত সহজে জ্ঞান হারাবার পাত্র আমি নই আরমান। একবার যখন এ বাড়িতে প্রবেশ করেছি তখন কিছু তথ্য আমাকে সগ্রহ করে নিয়ে ফিরতে হবে।

নূর!

হ্যাঁ আরমান। এবার তুমি এ শয্যায় শুয়ে থাকো, আমি কয়েকমিনিট পর ফিরে আসছি।

যদি ওরা কেউ এসে পড়ে?

ওরা এখন উৎসবে আত্মহারা, আসবে না।

আরমান কিছু বলবার পূর্বেই নূর সরে পড়লো।

পাশের দরজা দিয়ে এগুলো সে। একটি কক্ষ, তারপর গলিপথ, নূর সেই গলিপথে অগ্রসর হলো। ওপাশে আরও কয়েকটি সুসজ্জিত কক্ষ, মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত। নূর বুঝতে পারলো এগুলো গডসে ও তার সঙ্গীসাথীদের বাসস্থান। গডসে অন্তপুরে কোনো নারী নেই, কারণ গডসে নাকি এখনও কুমার রয়েছে। তবে তার নারীর অভাব নেই। নাচ-গান, হই হুল্লোড় চলে দলবল নিয়ে, তাতে অনেক নর্তকীর আগমন ঘটে। এ সংবাদ নূর পূর্বেই সংগ্রহ করেছিলো আর সে কারণেই বিনা দ্বিধায় অন্তপুরে প্রবেশ করলো।

নুর আরও এগুলো।

একটি অন্ধকার কক্ষ, সেই কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবলো প্রতিটি কক্ষে আলো জ্বলছে কিন্তু এ কক্ষ এমন আলোবিহীন কেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলো কোথাও সুইচ আছে কিনা। তার সন্দেহ সত্য, পাশেই একটি সুইচ।

নূর সেই সুইচে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপাশে আলো জ্বলে উঠলো। নূর সেই কক্ষে প্রবেশ করলো। দেখলো একটি সুরঙ্গপথ। মুহূর্ত বিলম্ব না করে নূর সেই সুরঙ্গপথে নেমে পড়লো। বেশ আলোকিত সুরঙ্গপথ। গভীর তলদেশে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ির ধাপগুলো। নূর আরও এগুলো, হঠাৎ একটা টর্চের আলোর মত কিছু তার চোখে এসে পড়লো। থমকে দাঁড়ালো নূর, দেখলো সেটা টর্চের আলো নয়, একটা আলোর বল চক্রাকারে ঘুরছে। নূরের চোখেমুখে সেই আলোর দৃষ্টি এসে পড়ছে।

আশ্বস্ত হলো নূর, কারণ সে ভড়কে গিয়েছিলো হঠাৎ কেউ এসে পড়লো কিনা। এখান থেকে হলঘরের মিউজিকের সুর বা হই হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে না।

নূর ভাবছে এ সুরঙ্গপথ কত দূর বা কোথায় গেছে। তার মনে প্রবল বাসনা জাগলো এ গভীর রহস্য তাকে উদঘাটন করতেই হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে সম্ভব হবে না, কারণ সে এখন অসুখের ভান করে শয্যায় শায়িত রয়েছে। উৎসবশেষে তার সন্ধানে আসবে গডসে। তার শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে তাকে কাজ করতে হবে।

আরও অবাক হলো নূর।

সুরঙ্গ পথের পাশে বিরাট একটি প্রশস্ত কক্ষ, গুদামঘর বলা যায়। নূর ঐ কক্ষে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে হতবাক হলো, অনেকগুলো বাক্স প্যাকিং করা রয়েছে, প্রতিটি বাক্সের মুখ এখনও আটকানো হয়নি। বাক্সের ঢাকনার অন্তরালে অবৈধ মাদকদ্রব্য বোঝাই করা হয়েছে। কোটি কোটি টাকার মাদকদ্রব্য এখান থেকে পাচার করা হয়, আর এসব কারণেই মিঃ গডসের এত আতঙ্ক বনহুরকে। যত সাবধানেই থাক না কেন, বনহুরের দৃষ্টি সে এড়াতে পারবে না, আর সে কারণেই পুলিশমহলের সংগে তার এত হৃদ্যতা গড়ে তুলেছে। কৌশলে পুলিশের সহায়তায় বন্দী করলো বনহুরকে আর সেই আনন্দ উদযাপিত করতে মিঃ গডসে নগরীর স্বনামধন্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

আরও অনেক রহস্য লুকায়িত রয়েছে এ সুরঙ্গপথের অভ্যন্তরে।

নূর আর বিলম্ব না করে ফিরে এলো তার সেই কক্ষে, যে কক্ষের শয্যায় তার জন্য অপেক্ষা করছিলো আরমান।

নূর ফিরে আসতেই আরমান হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

বললো আরমান–বাঁচালে বন্ধু, কি যে অস্থিরতায় ছিলাম। ভাগ্যিস ওরা কেউ এসে পড়েনি। এলে নিশ্চয়ই তোমার ছদ্মবেশ ফাস হয়ে যেতো.....

হেসে বললো নূর—আমি জানতাম আরমান, ওরা কেউ আসবে না। কারণ বনহুরকে গ্রেফতারের আনন্দে গডসে এতই বেশি আত্মহারা হয়ে পড়েছে যে, অন্য দিকে লক্ষ দেয়ার সময় বিশেষ তার নেই। পদশব্দ শুনতে পেলো তারা।

নূর তাড়াতাড়ি শয্যায় শুয়ে চোখ মুদলো।

আরমান পাশে বসে রইলো।

কক্ষে প্রবেশ করলো গডসে হন্তদন্ত হয়ে, ব্যস্তকণ্ঠে বললো, এখন কেমন আছেন উনি?

আরমান বললো, বড় দুশ্চিন্তায় আছি। মনে হয় এবার বাড়ি নিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

হ্যাঁ, তাই নিয়ে যান। আমার লোক আপনাদের পৌঁছে দেবে।

আরমান বললো–শুধু গাড়িতে উঠিয়ে দিলেই চলবে। গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে।

বেশ, যা ভাল মনে করেন তাই হবে। আমার আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নিয়ে আমি বেশ ব্যস্ত আছি কিনা।

আরমান বললো–তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আপনি কিছু মনে করবেন না।

আচ্ছা। গডসে চলে গেলো। যাবার সময় তীব্র দৃষ্টি মেলে একবার তাকালো আরমান ও নূরের দিকে।

নূর চাপাকণ্ঠে বললো–বেটা কিছু আঁচ করেছে নাকি?

আরমান বললো–ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে তার গলায় একটু সন্দেহের ছোঁয়া আছে।

নূর বললো–যা ভেবেছিলাম তাই। গডসে সাধুতার মুখোস পরা এক শয়তান। ওকে সায়েস্তা করাই হলো আমাদের কাজ। শুধু সায়েস্তা নয়, ওর সমস্ত ব্যবসার মূলে চরম আঘাত হানবো। আমি সব সন্ধান নিতে সক্ষম হয়েছি....

নূরের কথা শেষ হয় না, পদশব্দ শোনা যায়।

নূর শয্যায় গা এলিয়ে দেয়।

আরমান রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে থাকে।

গডসে এবং আরও দু'জন এলো তার সঙ্গে। ওদের সহযোগিতায় নূরকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলো আরমান।

গাড়িতে বসে শুনতে পেলো তারা গডসের বাড়ির হলঘরে আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে মিউজিকের আওয়াজ।

*

মিসরের সবচেয়ে বিস্ময়কর পিরামিড আর্মানহুড। গভীর রাতে এ পিরামিডের অভ্যন্তর থেকে একটি শব্দ ভেসে আসে যা মিসরীয়দের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। শব্দটা কিসের কেউ বলতে পারে না, বলতে পারে না ঐ বিস্ময়কর পিরামিডের তলদেশে কি আছে। কোনো ভূতত্ত্ববিদ আজও এ পিরামিডের গভীরে প্রবেশে সক্ষম হননি। কেউ এ আশ্চর্যজনক শব্দের রহস্য উদঘাটনেও সক্ষম হননি। এ রহস্যজনক পিরামিডের অভ্যন্তরে স্বয়ং দস্যু বনহুরকে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা আজকের নয়-দীর্ঘ সময়ের।

বহুদিন ধরে অতি গোপনে এ পরিকল্পনা করা হয় এবং তার প্রধান উদ্যোক্তা হলো গডসে। সুদীর্ঘ কাল থেকে গডসে কান্দাই এবং মিসরীয় প্রশাসনের সহায়তায় তৈরি করেছিলো নতুন এক পরিকল্পনা আর সেই মোতাবেক তৈরি করা হয়েছিলো কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে আর্মানহুড় পিরামিডের অভ্যন্তরে রহস্যপূর্ণ এক বন্দীশালা। যেখান থেকে আর কোনোদিন দস্যু বনহুর বেরিয়ে আসতে পারবে না।

আর্মানহুড পিরামিডের পাশাপাশি আরও কয়েকটি পিরামিড রয়েছে। মানুষের মুখাকৃতি পিরামিডগুলো রাতের জমাট অন্ধকারে এক একটি ভয়াবহ যমদূতের

মত মনে হয়। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় বা বজ্রপাত হয় তখন এগুলো যেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। এহেন পিরামিডগুলোর একটিতে বন্দী করে রাখা হবে বনহুরকে।

বিস্ময়কর বিমানখানা বনহুরকে নিয়ে মিসর বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। হাজার হাজার লোক বিমান বন্দরের বাইরে ভিড় জমিয়েছে, তারা একনজর এই বিশ্ববিখ্যাত দস্যুকে দেখতে চায়। বিপুল আগ্রহ নিয়ে তারা অপেক্ষা করছে। বিমানখানা আকাশে পরিলক্ষিত হবার সংগে সংগে মিসরীয়গণ সবাই তাকালো বিস্ময়কর বিমানখানার দিকে, ওর মধ্যে রয়েছে দস্যু বনহুর স্বয়ং।

এক সময় বিমানখানা রানওয়েতে নেমে পড়লো, চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে এসে থেমে গেলো।

বিমানখানার চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন রয়েছে। শুধু বিমানখানার চারপাশেই নয়, বিমান বন্দরের সব স্থানে কড়া পাহারা রয়েছে। বিমান বন্দরের বাইরে অগণিত জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কারও সাধ্য নেই বন্দরের ভেতরে প্রবেশ করে এমন কি কোনো যাত্রীবাহী বিমানও ঐ সময় অবতরণ করা নিষিদ্ধ ছিলো।

সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত বনহুর নেমে এলো বিস্ময়কর বিমান থেকে।

অগণিত দর্শক বাইনোকুলার চোখে বিমান বন্দরের বাইরের সুউচ্চস্থান হতে দেখছে। বনহুরের নাম তারা শুনেছে কিন্তু তাকে কেউ স্বচক্ষে দেখেনি। আজ তারা ব্যাকুল আগ্রহে। তাকে দেখছে সারা বিশ্ববাসী তার নাম শুনেছে, কিন্তু তাকে সবাই চেনে না।

পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাকে তুলে নেওয়া হলো ভ্যানে। মিসর রাজকুমারী স্বয়ং এসেছে বিমান বন্দরে দস্যু বনহুরকে একনজর দেখার জন্য। রাজকুমারী মীরা অতি নিকটে থেকে বনহুরকে দেখতে ইচ্ছা পোষণ করায় তাকে বিমানের কাছাকাছি একটি সুউচ্চ স্থানে আসন দেওয়া হয়েছে। রাজকুমারী মীরা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছিলো। তার চোখেমুখে বিস্ময়। মীরা ভেবেছিলো দস্যু বনহুর একটি ভয়ংকর চেহারার লোক হবে। যার ভয়ে বিশ্ববাসী আতঙ্কগ্রস্ত। মীরার মনে যে চেহারা দাগ কেটেছিলো তা নিমিষে মুছে গেলো। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলো দস্যু বনহুর অদ্ভুত সুন্দর সুপুরুষ। এত সুন্দর মানুষ

এমন ভয়ংকর দস্যু হতে পারে! তার হাতে হাতকড়া, দুবাহুতে আর কোমরে মোটা শিকল লাগানো রয়েছে। হতবাক মীরা তাকিয়ে আছে, পাশে তার পিতা মিসর সম্রাট আবদুল্লাহ শাহ।

মীরা জানতো তার পিতার সহযোগিতায় মিসর মিরামিড আর্মানহুড়ের অভ্যন্তরে দস্যু বনহুরকে বন্দী করার জন্য একটি মৃত্যুকূপ গহ্বর তৈরি করা হয়েছে। আর সেই কারণে মিসরীয় পুলিশবাহিনী এবং কান্দাই পুলিশবাহিনী মিলিত প্রচেষ্টায় বনহুরকে বন্দী করেছে। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-কৌশলে তাকে বন্দী করা হয়েছে।

মীরা পিতার দিকে চেয়ে বললো–বাবা, তুমি যেভাবে তোমার সরকার এবং কান্দাই সরকারকে উৎসাহিত করেছে বনহুরকে গ্রেফতারের ব্যাপারে তাতে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম কিন্তু বনহুরকে দেখার পর আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম, এমন একজনকে তোমরা ষড়যন্ত্র করে পাকড়াও করেছে যে ব্যক্তি মোটেই অসৎ হতে পারে না।

সম্রাট আবদুল্লাহ বললেন-তুমি তার চেহারা দেখে কথাটা বলছে মীরা। জানো না কত ভয়ংকর সে।

বাবা, তোমার কথা সত্য বলে মনে করতে পারছি না। আমি বাইনোকুলারে তাকে দেখতে পাচ্ছি। তাকে দেখার পূর্বে আমি যেমন ভেবেছিলাম মোটেই সে তা নয়। ওকে তোমরা ভুল বুঝেছো বাবা।

না, মোটেই ভুল বুঝিনি। কান্দাই সরকার আমাদের সহযোগিতা করেছে। দস্যু বনহুর শুধু কান্দই নয়, সারা পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। কান্দাইয়ের হাঙ্গেরী কারাগার এবং আরও কঠিন কারাগারগুলো তাকে আটকে রাখতে পারেনি....

মীরার দু'চোখে অপূর্ব এক দীপ্ত ভাব ফুটে উঠলো। সে আরও গভীর দৃষ্টি মেলে বাইনোকুলারে দেখতে লাগলো।

তখন বনহুরকে ভ্যানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় বনহুরের গাড়ি বিমান বন্দর ত্যাগ করে জনবহুল পথে চলতে শুরু করলো। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথের দু'ধারে ভিড় জমিয়ে আছে। তারা সবাই ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পুলিশ ভ্যানটির দিকে। প্রখ্যাত দস্যু

বনহুর তাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে এটা তারা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের মাঝে হুড়হুড়ি লেগে গেলল দস্যু বনহুরকে দেখতে।

পুলিশবাহিনী পরিবেষ্টিত বনহুরের দৃষ্টি সবকিছু লক্ষ্য করছিলো। মিসর তার কাছে পরিচিত, কারণ সবার অজ্ঞাতে মিসরে বনহুর কয়েকবার এসেছিলো। বনহুর জানতো তাকে আটক করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। কান্দই এবং মিসর সরকার মিলে মিসরে তৈরি করছে পিরামিডের অভ্যন্তরে, গভীর তলদেশে একটি কারাগার। এ সংবাদ পেয়েই বনহুর একজন শ্রমিকের বেশে মিসরে উপস্থিত হয়েছিলো এবং বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে মিসরে অবস্থান করেছিলো। পিরামিড আর্মান হুডের গহ্বরে তৈরি করা হচ্ছিলো তখন অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর কারাকক্ষ, যেখানে একটি মাত্র পথ থাকবে যা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বনহুর শ্রমিকবেশে এই গহ্বরের কাছে নিয়োজিত ছিলো এবং সেও প্রকৌশলীদের সঙ্গে পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছিলো।

মিসর সরকার জানতেও পারেনি যাকে বন্দী করার জন্য তাদের এ প্রচেষ্টা, সে-ই নিজে রয়েছে তারই জন্য মৃত্যুগঘর তৈরি কাজে শ্রমিকবেশে। বনহুর যখন মিসরীয় শ্রমিকদের দলে মিশে কাজ করছিলো তখন একদিন চা পানের সময় হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলো সে। অন্যান্য শ্রমিক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো তার মুখের দিকে, কেউ তার হঠাৎ এ হাসির কারণ বুঝতে পারেনি সেদিন।

একজন বৃদ্ধ শ্রমিক আশ্চর্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলো-ভায়া, তুমি অমন করে হাসছে

বনহুর হাসি থামিয়ে বলেছিলো–যাকে কোনোদিন চোখে দেখিনি তাকে আটক করে রাখার জন্য আমরা কত পরিশ্রম করছি। তাই হাসছি....

বৃদ্ধ শ্রমিকটি বলেছিলো আমরা পয়সা পাবো সেজন্য কাজ করছি। কাজ না করলে পেট ভরবে না।

অপর একজন বলেছিলো-যাকে এ মৃত্যুগহ্বরে আটক করা হবে তাকে চোখে আমরা না দেখলেও তার যে বর্ণনা আমরা শুনেছি, তা অবিশ্বাস্য ও আশ্চর্য বলা যায়। সারা পৃথিবীর মানুষ তার ভয়ে ভীত আর আতঙ্কিত। এক ভয়ংকর দস্যুকে বন্দী করে রাখার জন্য আমরা পরিশ্রম করছি, তাকে যেদিন আটক করা সম্ভব হবে সেদিন আমাদের শ্রম সার্থক হবে। কথাগুলো আজ বনহুরের মনে পড়েছে।

পথের দুপাশে অগণিত জনতার বিস্ময়কর দৃষ্টির মধ্যে বনহুর নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এদের মধ্যেই আছে সেদিনের শ্রমিকদের কেউ না কেউ। যারা সেদিন তাকে শ্রমিক হিসেবে দেখলেও আজ এ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে কিন্তু চিনতে পারছে না। ওরা যদি জানতো সেদিনের সেই শ্রমিক অন্য কেউ নয়, স্বয়ং দস্যু বনহুর তাহলে আরও অবাক হতো। এলোমেলো চিন্তা বনহুরকে ভাবিয়ে তুলছিলো। কিন্তু, সব চিন্তা ছাপিয়ে মায়ের মুখ ভেসে উঠছিলো তার মানসপটে। আর কোনোদিন সে মাকে দেখতে পাবে না। মায়ের স্নেহ থেকে বনহুর বঞ্চিত হয়েছে চিরদিনের মত। মা'র মুখ মনে পড়তেই বনহুর মনে গভীর ব্যথা ও অস্থিরতা বোধ করে। আজ তাকে বন্দী করা কঠিন ছিলো, কান্দাই এবং মিসরীয় সরকারের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতো যদি বনহুরের মাতৃবিয়োগ সংবাদ তার কানে না পৌঁছতো। মায়ের মৃত্যু সংবাদ শোনার পরমুহূর্তেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এবং সে কারণেই তাকে গ্রেফতার করা এত সহজ হয়েছে।

কান্দাই সরকার এমন এক সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলো।

বেশ কিছুদিন বনহুর কান্দাইয়ের বাইরে ছিলো, আর সে কারণেই অনেক সংবাদ তার জানা ছিলো না। কান্দাই ফিরেই বনহুর আস্তানায় না গিয়ে সোজা গিয়েছিলো মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মা'র অসুখ তা সে জানতো না, কিন্তু মনে সে একটা অজানা ব্যথা আর অস্বস্তি অনুভব করেছে। দুঃস্বপ্নের মতো নানা কথা স্মরণ হয়েছে। বৃদ্ধ মা ও বৃদ্ধ সরকার সাহেবের কথা বারবার স্মরণ হয়েছে তার। কখন কি ঘটবে কে জানে। বেশি করে মা'কে তার মনে পড়েছে, প্রায়ই মায়ের মুখ ভেসে উঠেছে তার মনের পর্দায়। মাকে হারানোর আশংকা বনহুরকে বিচলিত করেছে, তাই বনহুর মায়ের পাশে ছুটে এসেছিলো কিন্তু তার আশংকা সত্যে পরিণত হলো-মার দেখা সে পেলো না। মনটা বনহুরের হু হু করে কাঁদছিলো, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো সে।

এক সময় পুলিশ ভ্যান জনবহুল রাজপথ ত্যাগ করে নির্জন বালুকা প্রান্তর ধরে এগুতে লাগলো। অদূরে আর্মানহুড় পিরামিডের পথ। এ পথ বনহুরের অজানা নয়, সেই মরুর বালুকাময় পথ ধরে পুলিশ ভ্যান এগুচ্ছে, তার গাড়ির আগে দুটি পুলিশ ভ্যান, পেছনে আরও দুটি। প্রত্যেক পুলিশের হাতে উদ্যত রাইফেল।

সকলেই সতর্ক সজাগ।

পুলিশরা সবাই বনহুরের গাড়ি লক্ষ্য করে অস্ত্র উদ্যত করে রেখেছে।

বনহুর আর মিঃ কিবরিয়া পাশাপাশি বসেছে। কিবরিয়ার হাতেও উদ্যত রিভলভার। মাঝে মাঝে তিনি বনহুরের সঙ্গে কথা বলছেন। মিঃ কিবরিয়া বললেন-জানি তুমি উচ্চশিক্ষিত, বহু ভাষায় তোমার দক্ষতা আছে, জ্ঞান-গরিমায় তুমি অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু তুমি কেন এ পথ বেছে নিয়েছে জীবনের ব্রত হিসেবে। অবশ্য এ প্রশ্ন আমার একার নয়-বিশ্ববাসী সকলের।

একটু হেসে বললো বনহুর–এ বিশ্বের এমন কোনো ব্যক্তি আমি দেখি না যার মধ্যে স্বার্থ নেই। আমি আমার স্বার্থে দস্যুতা করি এবং এ পথ বেছে নিয়েছি।

কিবরিয়া বললেন-তোমার জবাবে আমি আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না। শুনেছি লোভ-লালসা-মোহ তোমার নেই, তবে কি স্বার্থ তোমার?

চিরদুঃখী অসহায় মানুষ যারা তাদের মুখে হাসি ফোঁটানোই আমার স্বার্থসিদ্ধি·.....

মিঃ কিবরিয়া বললেন-এ কথা বলে তুমি নিজকে দাতা হিসেবে জাহির করতে চাও? এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিতে চাও?

আপনার চিন্তাধারা মোটেই সত্য নয়। দাতা! একজন দস্যু নিজকে দাতা ভাববে এটা কেমন করে আপনি ভাবতে পারলেন? হাঃ হাঃ হাঃ, বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

মিঃ কিবরিয়ার দু'চোখে বিস্ময়। এমন করে তিনি কাউকে হাসতে দেখেননি–বিশেষ করে বন্দী অবস্থায়। বনহুর যখন হাসছিলো তখন মিঃ কিবরিয়া মুগ্ধ, হতবাক হয়ে দেখছিলেন, বহুদিন তিনি বনহুরকে কল্পনার চোখে দেখে এসেছেন, এমন করে পাশে বসে তাকে দেখবার সৌভাগ্য তার হয়নি। এত কাছে, তবু যেন বহুদূরে বলে মনে হচ্ছে তার। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মিঃ কিবরিয়া তার মুখের দিকে।

বনহুর বললো–আমি দাতা নই মিঃ কিবরিয়া, দাতা তারাই যারা আপনাদের চোখে ধুলো দেয়, পাথর মেরে আপনাদের চোখকে অন্ধ করে দিয়ে প্রকাশ্যে দেশ ও দশের সর্বনাশ করে যাচ্ছে। তারা আপনাদের কাছের মানুষ, কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে অসৎ ব্যবসা চালিয়ে দেশকে পঙ্গু করে দিচ্ছে আর হাতে হাত

মেলাচ্ছে আপনাদের মত কর্মকর্তাদের সঙ্গে। আপনারা বুঝতেও পারছেন না তাদের মুখোসের অন্তরালে আরও একটি রূপ আছে যা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না।

মিথ্যা তোমার সন্দেহ। পুলিশবাহিনীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। তারা সজাগ আর কর্তব্যপরায়ণ, অন্যায়কারীকে খুঁজে বের করতে তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। যদি আমাদের দৃষ্টি অন্ধ হতো তাহলে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে সক্ষম হতাম না আমরা। বনহুর, আপনি মনে রাখবেন আমরা পুলিশমহল সর্বদা সজাগ এবং কর্তব্য কাজে নিষ্ঠাবান।

হ্যাঁ, একথা সত্য আপনার। দেশ ও দশের আপনারা সেবা দিয়ে, শ্রম দিয়ে সেবক। জীবনের বিনিময়েও কর্তব্য কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু একশ্রেণীর লোক আছে যারা আপনাদেরকে ব্যবহার করছে নানা কৌশলে। তারা কারা তা আপনারা জানেন কিন্তু না জানার ভান করেন....যা আজ নয়, একদিন সবই অনুধাবন করবেন আপনারা, অবশ্য সেদিন বেশিদূরে নয়।

ততক্ষণে ভ্যানগুলো পিরামিড আর্মানহুডের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

ভ্যান থেকে পুলিশবাহিনী অস্ত্র বাগিয়ে ধরে নেমে পড়লো। ঘিরে ফেললো বনহুরের গাড়িখানাকে। সবাই অস্ত্র উদ্যত করে রেখেছে বনহুরের দিকে।

বনহুরকে নামানো হলো।

মিঃ কিবরিয়ার দক্ষিণ হাতে রিভলভার। মুহূর্তের জন্যও তিনি রিভলভার সরিয়ে নেননি। জয়ের সাফল্য মিঃ কিবরিয়ার চোখেমুখে। মিসরীয় পুলিশ প্রধানগণও তাদের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করে রেখেছেন। চারদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গিজগিজ করছে।

ক্রেন দ্বারা বনহুরকে নামানো হবে আর্মানহুডের ভিতরে। তাকে আর্মানহুডের গহ্বরে কবর দেওয়ার মত সমাধিস্থ করা হবে। পিরামিডটির ভেতরে বনহুরকে নামিয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে পাথর এবং সিমেন্ট দিয়ে। আর কোনোদিন বনহুর যেন পৃথিবীর আলো দেখতে না পায়। কান্দাই সরকার এবং মিসরীয় সরকার সুদক্ষ কুশলীদের নিয়ে এ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। প্রথমেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো কিছু খাবার এবং পানীয়। বনহুরকে তারা হত্যা

করতে চায়না, তাকে জীবিত অবস্থায় কঠিন শাস্তি দিতে চায়। আর সে কারণেই তাদের এ পরিকল্পনা।

বনহুরকে ক্রেনের উপর তুলে নেওয়া হলো।

মিঃ কিবরিয়া এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার সবাই সাফল্যের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। বনহুরকে ক্রেনের সাহায্যে নিচে নামানোর পূর্বে তার দেহের লৌহশিকলের বেষ্টনী এবং হস্তদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করে দেওয়া হলো। যখন বনহুরকে শৃঙ্খলমুক্ত করা হচ্ছিলো তখন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী চারদিকে উদ্যত রাইফেল এবং মেসিনগান ধরে রেখেছিলো সর্তকভাবে। যেন তারা মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক না হয়, এ কারণে বার বার তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই পুলিশ ফোর্স সজাগ হয়ে রইলো।

ক্রেনের ড্রাইভার হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে।

ক্রেন ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে।

বনহুর হাত নাড়ছে সবার উদ্দেশ্যে। পুলিশ বাহিনী এবং পুলিশ অফিসার অবাক, বনহুরের মুখে একটুও পরিবর্তন নেই, এতটুকুও বিচলিত নয় সে। পিরামিড আর্মানহুডের দিকে ক্রেন এগিয়ে যাচ্ছে। একটি বিরাট গর্ত, তার মধ্যে সুরঙ্গপথ তৈরি করা হয়েছে। যে পথ খাড়া এবং দুর্গম। ক্রেনের সাহায্যে বনহুরকে নামিয়ে দেওয়া হলো।

তারপর শুরু হলো গহ্বরের মুখ বন্ধের তৎপরতা। পাথর আর সিমেন্ট দিয়ে মজবুত করে পিরামিড আর্মানহুডের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রায় সমস্ত দিনরাত দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ কাজ চালিয়ে গহ্বরের মুখ কঠিনভাবে বন্ধ করে দেয়া হলো।

এবার কান্দাই সরকার এবং মিসরীয় সরকার নিশ্চিন্ত হলো। ওয়্যারলেসে সংবাদটা ছড়িয়ে দেওয়া হলো দেশ-বিদেশে। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাকে পিরামিড আর্মানহুডের অভ্যন্তরে বন্দী করা হয়েছে। আর কোনোদিন সে বেরিয়ে আসতে পারবে না। খবরটি প্রতিটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো নানাভাবে।

বিশ্ববাসী অনেকে খুশি হলো, আবার অনেকেই ব্যথায় মুষড়ে পড়লো। কারও কারও বাড়িতে আনন্দ উৎসব শুরু হলো, আবার অনেক দুঃখী অসহায় মানুষ ভেঙে পড়লো।

*

পিরামিড আর্মানহুডের অভ্যন্তর।

বনহুর এগুচ্ছে। আবছা অন্ধকার।

তখনও তার কানে ভেসে আসছে পিরামিডের মুখগহবর পাথর দিয়ে বন্ধ করার শব্দ। হাতুড়ি বা ঐ ধরনের ভারী কোনো বস্তুর আওয়াজ। বনহুর নিশ্চিন্ত, সে যা চেয়েছিলো তাই হয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে বনহুর হারিয়ে গেলো। মা বেঁচে নেই, থাকলে তিনি খুব কষ্ট পেতেন। মনিরা, নূর এরা দুঃখ পাবে। আস্তানার কথাও মনে পড়ে বনহুরের।

যতই এগুচ্ছে বনহুর ততই বিস্মিত হচ্ছে। পিরামিডের অভ্যন্তরে এমন দৃশ্য দেখবে ভাবতে পারেনি সে; অনেক গভীরে নেমে এসেছে সে। এত নিচে কেউ নামতে পারেনি, একটা অপ্রশস্ত পথ ধরে বনহুর গহ্বরে নেমে এসেছে। মৃত্যুভয়ে বনহুর কোনোদিনই ভীত নয়। আজও বনহুর দুর্দমনীয় সাহস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পিরামিডের গভীর তলদেশে প্রশস্ত একটি জায়গা। সেখানে দৃষ্টিপড়তেই বনহুর অবাক হলো, একটি শবাধার সুউচ্চ স্থানে রাখা হয়েছে। শবাধারের চারপাশে স্বর্ণখচিত বেষ্টনী। আশেপাশে রৌপ্যপাত্রে থরে থরে সাজানো হীরা-মণি-মাণিক্য। বহুকাল হলো সেগুলো রাখা হয়েছে, তা থেকে আলোদ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চারধারে ধুলোবালি আর মাকড়সার জাল, বনহুরের চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার গুপ্ত ভান্ডারেও এত হীরা, মণি-মাণিক্য মজুত নেই। বনহুর আল্লাহতালার কাছে শুকরিয়া করে নিলো। পিরামিডের অভ্যন্তরে এত সম্পদ। বনহুর গভীরভাবে ভাবতে লাগলো। যারা তাকে এ পিরামিডের অভ্যন্তরে বন্দী করার জন্য কৌশলে বুদ্ধি এঁটেছিলো, তারাই জানতো না পিরামিড আর্মানহুডের গহবরে এত ধন-রত্ন লুকিয়ে আছে। জানলে হয়তো মিসর সরকার, কিছুতেই মত দিতো না আর্মানহুডের অভ্যন্তরে বনহুরকে আটক করতে। এত নিচে তারা প্রবেশ করতেও সক্ষম হতো না কোনোদিন। বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই, তাই সে কৌশলে পিরামিডের তলদেশে প্রবেশ করেছে।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করে আরও অবাক হলো।

শবাধারের কাছাকাছি একটি সুন্দর পাথরখন্ড। বনহুর পাথরখন্ডটি সরিয়ে ফেলতেই চমকে উঠলো, একি! সুরঙ্গপথ! সুরঙ্গপথটার ভেতরে বহুদিনের ঝোঁপঝাড় এবং জঙ্গল। ওর মধ্যে প্রবেশ করা এ মুহূর্তে নিরাপদ নয় মোটেই। বনহুর এবার শবাধারের পাশে গিয়ে শবাধারের ঢাকনা খুলে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু বহুদিন বন্ধ থাকায় ভীষণ শক্ত হয়ে গেছে শবাধারের মুখ।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে বনহুর ঢাকনা খুলে ফেললো। খুলতেই ভীষণভাবে চমকে উঠলো সে, ভেতরে একটি নারীদেহ। ফুলের মত সুন্দর মুখমন্ডল, চোখ দুটি মুদিত। দেহ এবং দেহের চামড়া মোটেই ভ্রুকুঞ্চিত নয়। শুভ্র আচ্ছাদনে দেহ আবৃত। হাজার হাজার বছর পূর্বের শব কি করে এমন সজীব রইলো ভেবে অবাক হলো বনহুর। এমনকি তার বসনও বিনষ্ট হয়নি। বনহুর ভাল করে তাকালো মৃতদেটার দিকে। বহু মমি বনহুর দেখেছে কিন্তু সে সব মমির সঙ্গে এ মমির কোনো মিল নেই।

বনহুরের মনে কেমন যেন সন্দেহের দোলা লাগলো।

ধীরে ধীরে শবাধার যেমন ঢাকা ছিলো, ঢাকনা দিয়ে তেমনিভাবে ঢেকে রাখলো। তারপর যে পুরানো সুরঙ্গ মুখ আবিস্কার হলো তার দিকে ঝুঁকে পড়লো। শবাধারের কাছেই দেখলো একটি লম্বাকৃত লৌহখন্ড, মরচে ধরা-কোনো অস্ত্র হবে। বনহুর ওটা হাতে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে গুড়ো হয়ে ঝরে পড়লো। হয়তো বহু বছর পূর্বের সে অস্ত্র, তাই এভাবে : গুড়ো হয়ে গেলো।

বনহুর অবাক হয়ে ভাবলো, একটি লৌহখন্ড দীর্ঘ সময়ে মরচে ধরে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে অথচ শবাধারের মৃতদেহটি এখনও সজীব রয়েছে। বনহুর তখন ক্ষুধাবোধ করছিলো, সে তার খাবার এবং পানীয়ের সঙ্গে এই মমির ভান্ডগুলোর পাশে ফিরে এলো।

*

বনহুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। পানীয় পান করছিলো এমন সময় একটা শব্দ ভেসে এলো তার কানে। বিরাট পাথর সরানোর আওয়াজ। বনহুর হাতের পিঠে

মুখ মুছে উঠে দাঁড়ালো। অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলো যে স্থানে শবাধারটা ছিলো সে দিকে।

বনহুর দেখতে পেলো, একটা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো, একপাশে একটি পাথরখন্ড সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তারপর একটি হাত-লোমশ বাহু, নখগুলো বকা হয়ে আছে। বনহুরের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। এ হাত কি মানুষের? তারপরই বেরিয়ে এলো পাথর সরিয়ে একটি মুখ। বিকৃত, ভয়ংকর সেই মুখ।

ভাবতেও পারেনি বনহুর পিরামিডের অভ্যন্তরে এমন একটি দৃশ্য সে দেখবে। বনহুর বুঝতে পারলো এটা কোনো জন্তু বা বন মানুষ নয়,আসল মানব, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

ততক্ষণে বিকৃত আকার লোকটি পাথর সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তার সমস্ত দেহে ঘন লোমলোমশুলো কটা এবং খাড়া। মাথার চুলগুলো জটা ধরা এবং লম্বা, পিঠে ও কাঁধে ছড়িয়ে আছে। চোখ দুটো কপালের চেয়ে উঁচু এবং বেশ বড়। দাঁতগুলো ঠোঁটের উপরে। বেরিয়ে আছে। পায়েও তেমনি নখ, উরু দুটো তালগাছের ন্যায় মোটা। উরুতেও লোমভর্তি। মানুষবেশি জীবটার পরনে একটুকরো অজগরের চামড়া, শুধু কোমরে পেঁচিয়ে রেখেছে।

বনহুরের নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে।

বিস্ময়ভরা অপলক চোখে দেখছে বনহুর। এ জীবটা জানোয়ার নয়-মানুষ। এবং বহুকাল পূর্বে তার জন্ম এটা তার শরীর দেখেই বনহুর অনুমান করে নিলো। বয়স কত হবে আন্দাজ করা মুশকিল।

বনহুর সতর্কভাবে লক্ষ্য করছে। এবার লোকটা সোজা শবাধারটির কাছে গিয়ে বসলো। তারপর অনায়াসে খুলে ফেললো শবাধারের ঢাকনাটা। শবাধারে প্রবেশ করিয়ে দিলো তার হাত দু'খানা, বের করে আনলো সুন্দরী তরুণীর প্রাণহীন দেহটা। বেশ কিছুক্ষণ হাতের ওপর নাড়াচাড়া করলো, যেমন কোনো শিশু তার পুতুলটিকে নেড়েচেড়ে দেখে ঠিক তেমনি করে।

বনহুর বিস্ময়ে হতবাক, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে জীবনে বহু আশ্চর্যজনক। জিনিস, বস্তু, প্রাণী এবং আরও অনেক কিছু দেখেছে কিন্তু এমন

ব্যাপার সে কোনোদিন দেখেনি। পিরামিড মানে কবরের ওপরে একটি মনুষ্যাকৃতি মূর্তি বা ঐ ধরনের স্তম্ভ। বনহুর জানতো পূর্বে রাজ-রাজড়া বা রাজ-পরিবারের কারও মৃত্যু ঘটলে তাকে শবাধারে রাখা হতো এবং তার শবাধারের ওপর পিরামিড বা স্তম্ভ তৈরি করা হতো। মিসরীয় পিরামিডগুলো এক একটি কবর বা স্মৃতিসৌধ। শবাধারে যে মৃতদেহ সংরক্ষণ করা হতো সেই মৃতদেহটিকে মমি তৈরি করার পর শবাধারে রাখা হতো। মমি তৈরি করার কৌশল মিসরীয় বৈদ্যগণ জানতো। মমি তৈরি করবার পূর্বে মৃতদেহের পেট চিরে নাড়ীভুড়ি বের করে ফেলা হতো, তারপর মৃতদেহটির পেটের মধ্যে ওষুধ ভরে সেলাই করা হতো। প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত মিসরের শবদেহকে মমি বলা হয়। বনহুর শবাধারের ঢাকনা খুলে প্রথম অবাক হয়েছিলো কারণ, শবটি সম্পূর্ণ সজীব মনে হচ্ছিলো।

লোমশদেহী লোকটা শবদেহটি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে এবার শুইয়ে দিলো শবাধারের ওপরে। তারপর সে নিজের জটাধরা চুলের মধ্য হতে সদ্য তুলে আনা একগোছা শিকড় বের করে হাতের তালুতে রগড়ে রস করে নিলো, তারপর শবদেহটির মুখ হা করে হাতের তালুর রস ঢেলে দিলো মুখগহ্বরে।

বনহুরের চোখে পলক পড়ছে না।

অবাক হয়ে দেখছে সে। অবশ্য প্রথমেই শবাধারটি লক্ষ করে বনহুর বিস্মিত হয়েছিলো, কারণ শবাধারটির ওপরে তেমন কোনো ময়লা জমে ছিলো না দেখে মনে হয়েছে যেন শবাধারটি কেউ রোজ পরিষ্কার করে যায়। পাশে নানা ধরনের ধূলাবালি আর মাকড়সার জালে সবকিছু আচ্ছাদিত অথচ শবাধারটি পরিচ্ছন্ন ছিলো। এতক্ষণে বনহুরের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। লোমশ লোকটা শবটির মুখে শিকড়ের রস ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হাঁটু গেড়ে বসে রইলো। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর–একি অবিশ্বাস্য অসম্ভব ঘটনা-সে দেখলো, শবটি ধীরে ধীরে চোখ মেলছে, তাকালো সে লোমশ লোকটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, মিসরীয় ভাষায়, না না, আমাকে ছেড়ে দাও.....আমাকে ছেড়ে দাও......আমাকে মরে বাঁচতে দাও...

লোমশ লোকটি ঠিক সেভাবেই জবাব দিলোডমী, ডমীলু, আমি তোমাকে ভালবাসি তোমার ভালবাসার জন্যই আমি বেঁচে আছি ডমী....

আমি মরে গেছি, কেন আমাকে তুমি বার বার জীবিত করো....আমি মরে গেছি...আমাকে ছেড়ে দাও....মুক্তি দাও....

বনহুর ভীষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত, অভিভূত হয়ে গেছে। মৃতদেহে কি করে জীবনের সঞ্চার হতে পারে-এ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব। লোমশ দেহী তার চুলের জটাজুটের মধ্য হতে যে শিকড় বের করলো তার এমনকি শক্তি যা মৃতকে জীবিত করতে পারে। এও কি সম্ভব! বনহুর দু'চোখ বিস্ফারিত করে দেখছে, ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে তার কাছে। বনহুর একবার তাকালো পিরামিডটির উপরিভাগে। পাথর আর সিমেন্ট দ্বারা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে পিরামিডটির মুখ গহবর কিন্তু তলদেশে এমন কোনো পথ আছে যে পথে লোমশদেহী প্রবেশ করে অনায়াসে। অবশ্য বনহুর যখন আর্মানহুডের গহ্বরে এক বিস্ময়কর কারাগার নির্মাণের সময় শ্রমিকবেশে কাজ করছিলো তখন সে তার মধ্য হতে বেরিয়ে আসার পথও চিন্তা করেছিলো। যখন বনহুরকে ক্রেনের সাহায্যে পিরামিডের অভ্যন্তরে নামানো হচ্ছিলো তখন বনহুরকে কিছুমাত্র ম্লান বা বিষণ্ণ মনে হয়নি। কারণ বনহুর জানতো তাকে আটকে রাখার মত কারাগার এখনও বিশ্বে তৈরি হয়নি। সমস্ত ভরসা তার আল্লাহ।

বনহুর এমন এক অবস্থায় পড়বে ভাবতে পারেনি। এ পৃথিবীতে কত রহস্যই না লুকিয়ে আছে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। ভূগর্ভে, সাগরতলে, মহাশূন্যে-পৃথিবীর মানুষ যার সন্ধান জানে না।

বনহুর দেখলো শবদেহটি জীবন্ত হয়ে উঠছে, তার চোখেমুখে ভীত আর ভয়ংকর : আতঙ্কের ছাপ, চিৎকার করে সে বলছে-তোমার পা ধরছি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও.......

লোমশদেহী সুন্দরী তরুণীর গন্ড দেশে চুম্বন দিয়ে বললো–ডমীলু, আমার ভালবাসা, আমার প্রেম তোমাকে আজও জীবিত রেখেছে....আমাকে উপেক্ষা করো নাপৃথিবীর সবাই জানে তুমি মরে গেছো...তুমি যেদিন মৃত্যুবরণ করলে সেদিন তারা মনে করেছিলো সত্যই তুমি মরে গেছে, আর সে কারণেই তোমার পিতা সম্রাট ইয়ানুলোমী তোমাকে সমাধিস্থ করবার পূর্বে আমাকে ভোমার শবদেহের মমি তৈরি করার জন্য ডেকেছিলেন.....

কথাগুলো বড় থেমে থেমে বলছে লোমশদেহী। তার ও তরুণীর কথাগুলো মিসরীয় ভাষায় ছিলো। বনহুর বেশ কয়েকটি ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলো। এমন

কি কথাও বলতে পারতো সে। মিসরীয় ভাষায় বনহুর দক্ষ ছিলো তাই তাদের কথাবার্তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। বনহুর এক বিস্ময়কর কাহিনী শুনছে।

তরুণী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো–তুমিই কি সেই বৈদ্য মাংসিয়াংতু.....তুমি এ কথা এতদিন বলোনি কেন....আমি জানতাম তুমি আমাকে ভালবাসতে আমার রূপে তুমি পাগল হয়ে গিয়েছিলে.... কিন্তু.....

হ্যাঁ, আমিই বৈদ্য মাংসিয়াংতু। সেদিনের তরুণ সিয়াং যাকে তুমি তোমার ভালবাসা দিতে কার্পণ্য করেছিলে আমি.....আমি তোমার জন্য সাধনা করেছি.....তুমি আসলেই মরে যাওনি, তোমার চিকিৎসক দ্বারা তোমাকে মৃত ঘোষণা করে আমি তোমার দেহ কৌশলে মমি তৈরি করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম.....

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো তরুণীটি-এসব কি বলছো....আমি ঠিক বুঝতে পারছি না.....

বললো লোমশদেহী-সুদীর্ঘকাল ধরে আমি প্রতীক্ষা করছি......তোমাকে আমার চাই...হ্যাঁ, তোমার মৃতদেহ মমি করার দায়িত্বভার আমাকে দেওয়া হয়... আমি কৌশলে আমার সাধনার দ্বারা বহু চেষ্টায় তৈরি ঔষধ তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেই। যে ওষুধ দ্বারা তোমাকে জীবন্ত করে রেখেছি। তোমার শরীরে এমন একটি ওষুধ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি যা তোমাকে সজীব করে রাখবে যুগ যুগ ধরে। কোনোদিন তোমার দেহে পরিবর্তন আসবে না

তুমি তাহলে...

হ্যাঁ, আমার সাধনা সফল হয়েছে।.....আমি নিজেও আজ হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছি সেই মহা ওষুধের গুণে.....তোমাকেও জীবিত রাখার ক্ষমতা অর্জন করেছি...তোমার পিতামহ, পিতা এবং তারপর বহু পূর্বপুরুষগণ মৃত্যুবরণ করেছে তবু তুমি জীবিত....

তাহলে আমি হাজার বছর ধরে এই শবাধারে পিরামিডের গহ্বরে....

ঘুমিয়ে আছ। আমি, শুধু আমিই জানি তুমি মরোনি, আমি নিজেও মরণকে জয় করেছি। তুমি বলো, একবার বলো আমাকে তুমি ভালবাসো.....

লোমশদেহী সুন্দরী তরুণীর দেহ দুটি লোমশ বাহু দিয়ে চেপে ধরলো। ঘৃণায় সুন্দরীর নাসিকা ভ্রুকুঞ্চিত হলো। নিজকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। সে তার দুহাত দিয়ে লোমশদেহীর বাহু দুটির লোম ছিঁড়তে লাগলো।

এমন ঘটনা বনহুর কোনোদিন শোনেনি। মমি তৈরির অজুহাতে বৈদ্য মাংসিয়াংতু মিসরের রাজকুমারী ডমীলুকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত প্রমাণিত করে তার বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি জীবনৃতসুধা পান করিয়ে অথবা ঐ ধরনের ওষুধ তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে তাকে সজীব রাখা হয়েছে। বনহুর যতই ভাবে ততই বিস্মিত হয়। হাজার হাজার বছর ধরে জীবিত রাখতে পারে এমনকি মহা ওষুধ বৈদ্য মাংসিয়াতু তৈরি করেছিলো যা এত বিস্ময়কর।

ডমীলু যখন মাংসিয়াংতুর দেহের লোম টেনে ছিঁড়ছিলো তখন সে বিকট শব্দে হাসিতে ফেটে পড়লো। তার হাসির শব্দের প্রতিধ্বনি পিরামিড আর্মানহুডের পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে ঘুরে ফিরছিলো।

মাংসিয়াংতু হাসি থামিয়ে বললো–তোমার পিতা সম্রাট তোমাকে সমাধিস্থ করার সময় তিনি তার সমস্ত রাজভান্ডার উজার করে তোমার শবাধারের পাশে হীরা-মণি-মানিক্য সাজিয়ে রাখেন। অনেকেই মনে করতো তোমার পিতার রাজ্যলোতে তোমার পিতার ধনরত্নের লোভে আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, হয়েছি উম্মাদ কিন্তু তোমার পিতার ধনভান্ডারের জন্য নয়, তোমাকে-তোমাকে ভালবাসি তাই....

না, আমি তোমাকে ভালবাসি না...আমাকে তুমি মুক্তি দাও....

কি বললে তোমাকে মুক্তি দেবো.....আর মুক্তি দেওয়ার জন্যই কি এই অপেক্ষা আমার....যুগ যুগ ধরে আমি নিজেকে জীবিত রেখেছি শুধু তোমাকে পাওয়ার আশায়.....

তুমি আমাকে ছেড়ে দাও রেহাই দাও আমাকে ভেবে দেখার সময় দাও.....

আর কতদিন তোমাকে ভেবে দেখার সুযোগ দেবো.....ডমীলু, ডমীলু তুমি আমার তুমি, রাজকুমারী আর আমি একজন সাধারণ বৈজ্ঞানিক-বৈদ্য বারসিয়াংতুর ছেলে-বাবার পেশা ছিলো মিসরের মৃত দেহগুলোকে মমি তৈরি

করা...বাবা মরে গেলে তার ব্যবসা যেন আমি চালাতে পারি, এ কারণে বাবা আমাকে মমি তৈরি করা শিক্ষা দিয়েছিলেন,..কিন্তু আমি মমি তৈরি শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম মৃতদেহ যেমন সজীব রাখা যায় তেমনি জীবিত মানুষকে ওষুধের দ্বারা বাঁচিয়ে রাখা যায় কিনা....আমি বহু চেষ্টার ফলে আবিষ্কার করলাম সেই মহা জীবম্মুত ওষুধ যার দ্বারা আমি তোমাকে আজও পৃথিবীর বুকে চির তরুণ অবস্থায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। বহুদিন ধরে তোমার পরিধেয় বস্ত্রাদি সংগ্রহ করেছি তোমার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাকে নগরবাসীদের কাছে নাজেহাল হতে হয়েছে, আমাকে দেখলে সবাই ভীত আতঙ্কিত হয়,....মিসরীয়দের মধ্যে আমি একটি ভয়াবহ জীব...

কথাগুলো বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে মনোযোগ সহকারে শুনলো। ভাগ্যিস সে মিসরীয় ভাষা জানতো বুঝতো তাই তার খুব খুশি লাগছিলো, আনন্দ হচ্ছিলো।

বনহুর লক্ষ করছিলো কিভাবে লোমশদেহী এবার বেরিয়ে যায়। তবে যে পথে সে প্রবেশ করেছে ঐ পথেই সে বেরিয়ে যাবে তাতে কোনো ভুল নেই। স্তব্ধ নিঃশ্বাসে তাই বনহুর প্রতীক্ষা করছিলো।

লোমশদেহী এবার চুলের মধ্য হতে আর এক থোকা শিকড় বের করে পাশে রাখলো, তারপর একটি পুরোন ধরনের শিশি বের করে কিছুটা তরল পদার্থ হাতের তালুতে ঢেলে বললো–নাও, খেয়ে নাও, তারপর ঘুমিয়ে পড়ো....গভীর ঘুমে ঢলে পড়ো...ঐ দেখো তোমার বাবার রেখে যাওয়া মণি-মাণিক্য আমি কোনোদিন স্পর্শ করিনি...ওসবের ওপর আমার কোনো লোভ-লালসা ছিলো না এবং আজও নেই।

সম্রাটকন্যা একবার করুণ দৃষ্টি মেলে ঐ সব হীরা মণি-মাণিক্যের দিকে তাকিয়ে দেখলো। হয়তো পিতার কথা তার মনের গহনে উদয় হলো। কত ভালবাসতো তার পিতা তাকে। হঠাৎ কন্যার মৃত্যু তাকে পাগল করে দিয়েছিলো। শয়তান বৈদ্য মাংসিয়াংতু দেখেছিলো কোনো সময় রাজপরিবারে চিকিৎসা ব্যাপারে এসে। সেই হতে সে পাগলের মত তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তারপর সে নানাভাবে, নানা রকমে রাজপরিবারে যাওয়া আসার সুযোগ করে নেয়। পত্র দিয়ে বহুবার সে মনোভাব জানিয়েছিলো ডমীলুর কাছে। সব আজ ডমীলুর মনে পড়ে। তার কাছে হাজার হাজার বছর সেদিনের কথা বলে মনে হয়। সে জানে না তার বাবা-মা, রাজপরিবারের কেউ আজ জীবিত আছে কিনা। মাংসিয়াংতু যখন শিশি থেকে তরল ওষুধ ঢালছিলো তখন তার মুখ মৃতের মুখের

মত ফ্যাকাশে লাগছিলো। দু’চোখে তার বড় অসহায় করুণ চাহনি, সে চায় না ঐ ওষুধ পান করে আবার সে মৃত হয়। তবুও তাকে পান করতে হবে। এমনি করে দিনের পর দিন তাকে সেই মহাশক্তি ওষুধ দ্বারা জীবিত করা হয়, আবার তাকে ঐ বোতলের তরল ওষুধ পান করিয়ে অজ্ঞান করা হয়। যুগ যুগ ধরে এ কাজ লোমশদেহী করে আসছে। তরুণী তাই ভীত হলেও তেমন করে আপত্তি জানাচ্ছেনা।

লোমশদেহী বোতলের কিছুটা ওষুধ হাতের তালুতে ঢেলে তরুণীর ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো।

তরুণী বললো–না না, আর ঐ ওষুধ আমাকে খাইও না। আমি আর মরতে চাই না। আমার বাবার কাছে আমাকে যেতে দাও..আমার পরিবারের কাছে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো….তোমার পায়ে পড়ি মাংসিয়াংতুতুমি যা চাও আমি তাই দেবো…..

আবার লোমশদেহী হেসে উঠল-হাঃ হাঃ হাঃ, তোমার বাবা… রাজপরিবার….তা তো হাজার বছর আগের কথা….আজ তাদের কেউ বেঁচে নেইসবাই মরে গেছে…কালের অতলে তলিয়ে গেছে সবকিছু…..যেখানে তোমার বাবার রাজপ্রাসাদ ছিলো আজ সেখানে সাগর…..গভীর জলে তলিয়ে গেছে তোমার বাবার রাজ্য….নতুন রাজ্য গড়ে উঠেছে নতুন রাজা, রাজপ্রাসাদ…সব ঠিক নিয়ম মতোই চলছে…..শুধু কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে পুরোন ইতিহাস… শুধু বেঁচে আছি আমি আর তুমি…নাও, দেরী করোনা খেয়ে নাও লক্ষীটি।

এবার ডমীলু লোমশদেহীর হাতের তালুর ওষুধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললো। তারপর ধীরে ধীরে লোমশদেহীর হাতের ওপর ঢলে পড়লো। এবার লোমশদেহী ডমীলর সংজ্ঞাহীন দেহটা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলো শবাধারের মধ্যে এবং শবাধারের ঢাকনা বন্ধ করে দিলো।

বনহুর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ করছে। লোমশদেহী শবাধারে ডমীলুকে রেখে ঢাকনা বন্ধ করার পর মাথার জটাজুটের মধ্য হতে একগোছা শিকড় বের করে শবাধারের তলদেশে গুঁজে রাখলো তারপর পাথরখন্ডটি সরিয়ে যে পথে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে।

শবাধারের পাশে এসে দাঁড়ালো, ভালভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সবকিছু। ভাগ্যিস সে মিসরীয় ভাষা জানতো তাই লোমশদেহী ও শবাধারে রক্ষিত তরুণীটির সব কথাবার্তা বুঝতে পারলো। একটা বিরাট জানার বাসনা তার সমস্ত চেতনাকে সজাগ করে তুললো। শবাধারের পাশে রক্ষিত শিকড়গুলো বের করে ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগলো। শিকড়গুলো বেশ রসালো সজীব। একটু চাপ দিলেই রস বেরিয়ে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাটির সংস্পর্শে এ শিকড়গুলো শুকিয়ে যাবে না, তাই লোশমদেহী মাটির কাছে রেখেছে ওগুলোকে।

ঐ শিকড়গুলো হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলো বনহুর। তারপর যেস্থানে ওগুলো রেখেছিলো সেই স্থানে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। যে পথ দিয়ে লোমশদেহী পিরামিডের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো বনহুর সেদিকে পা বাড়ালো। কিছুক্ষণ দেয়ালের গায়ে পাথরখন্ডটি নেড়েচেড়ে দেখলো। পাথরখন্ডটি আগলা, কিছুটা নড়বড়ে। বনহুর বেশ বুঝতে পারলো পাথরখন্ডটি দিয়ে লোমশদেহী সুরঙ্গপথের মুখটা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। নিশ্চয়ই ওপাশে একটি পথ আছে। আর সেই পথটি লোমশদেহী তৈরি করে নিয়েছে। বনহুর একটা আনন্দ অনুভব করলো। নতুন একটা কিছু আবিষ্কারের আশায় চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তবে কিছুক্ষণ বিলম্ব করা উচিত, কারণ লোমশদেহী কতদূর গেছে তা সে জানে না।

এবার বনহুর শবাধারটির ঢাকনা খুলে ফেললো। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো সে। কিছুক্ষণ ধরে। একটু পূর্বেও এই তরুণী সুন্দর ভাষায় কথা বলছিলো, আর এখন সে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায়। আশ্চর্য এক ওষুধের বলে তাকে মৃত বানানো যায় আবার তাকে জীবিত করাও যায় সেই বিস্ময়কর ওষুধের বলে? এ পৃথিবীতে এমন সব জিনিস রয়েছে যার শক্তি বা গুণাগুণের হদিস কেউ জানে না।

বনহুর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো, তারপর পাথরখন্ডটি সরিয়ে ফেললো। একটি সুরঙ্গপথ, বনহুর সেই সুরঙ্গে প্রবেশ করলো। কিছুটা এগুতেই জমাট অন্ধকার লাগছে তার চোখে। বনহুর হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চললো।

বহুক্ষণ চলার পর হঠাৎ বনহুর শরীরে ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করলো। বুঝতে পারলো এ সুরঙ্গপথে পৃথিবীর আলো বাতাস প্রবেশ করছে। একটু আনন্দ অনুভব করলো বনহুর মনে, যে পিরামিডের অভ্যন্তরে তাকে বন্দী করার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে কলা-কুশলী নিয়োগ করা হয়েছিলো যেন বনহুর আর পালাতে না পারে। কিন্তু পথ তার জন্য পূর্ব হতেই তৈরি হয়েছিলো। নিজের মনেই হাসলো

বনহুর। কোনো মানুষ তাকে বন্দী করে রাখতে পারবে না কোনোদিন। একমাত্র আল্লাহতায়ালা তার সহায়।

বনহুর বেরিয়ে এলো এক সময় পিরামিড আর্মানহুডের অভ্যন্তর থেকে। গভীর জঙ্গল আর ছোটবড় পবর্তমালা। বনহুর যখন গভীর জঙ্গলে এসে দাঁড়ালো তখন আকাশে তারার মেলা। ঘন জঙ্গলের ফাঁকে দেখা গেলো তারাগুলো মিট মিট করে জ্বলছে।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো বনহুর।

হঠাৎ একটা শব্দ-বিকট গগনভেদী শব্দ। ভীষণভাবে চমকে উঠলো বনহুর। এ শব্দ কিসের কেউ জানে না, বনহুরও বুঝতে পারলো না। ভালভাবে শব্দটা শুনতে চেষ্টা করলো সে। শব্দটা একটানা হচ্ছে। তবে বেশিক্ষণ শব্দটা শোনা গেলো না, ধীরে ধীরে থেমে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যে। বেশ অনুধাবণ করলো কোনো মেশিন দ্বারা পাথর কাটার শব্দ বলে মনে হলো বনহুরের কাছে।

বনহুর গভীরভাবে ভাবতে লাগলো এ শব্দের রহস্যের কথা।

*

মিসরীয় সম্রাট আবদুল্লাহর কন্যা মীরা খুব দুঃখ পেয়েছে তার পিতা একজন বিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ সম্রাট হয়ে কি করে এমন একটি প্রস্তাব সমর্থন করলেন। দস্যু বনহুর শুধু একজন দুর্ধর্ষ দস্যুই নয়, সে একজন দয়ালু এবং দাতাও। এ কাহিনীও মীরা অবগত ছিলো। যখন মীরা পিতার সঙ্গে মিশর বিমান বন্দরে প্রখ্যাত দস্যুকে একটিবার স্বচক্ষে দেখার জন্য গমন করেছিলো, তখনও তার মনে এমন কোন ক্ষোভ ছিলো না। কিন্তু যখন সে দস্যু বনহুরকে দেখলো তখন তার মনপ্রাণ দুঃখ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। দস্যু বনহুর শুধু দয়ালু এবং দাতাই নয়, সে একজন সৌম্য, সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষ। তাকে কান্দাই সরকার এবং মিসরীয় সরকার মিলিত প্রচেষ্টায় সুকৌশলে আর্মানহুড পিরামিডের অভ্যন্তরে বন্দী করবে এবং তার জীবনের অবসান ঘটাবে। তাকে চিরতরে এ পৃথিবী থেকে বিদায় দেবে, এটা যেন মীরা মেনে নিতে পারলো না। এ ব্যাপার নিয়ে মীরা পিতার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করলো এবং ক্ষুব্ধ হয়ে সে পিতার কক্ষ ত্যাগ করলো।

সম্রাট আবদুল্লাহ ভীষণ চিন্তিত এবং ব্যথিত হলেন। মীরা যে দস্যু বনহুরকে নিয়ে এমন করে ভাববে তা তিনি কল্পনাও করেননি। মীরা যখন হঠাৎ বলে বসলো, পিতা, আপনি একজন দক্ষ ও ন্যায় বিচারক, অথচ বিনা অপরাধে একটি জীবন এভাবে বিনষ্ট করলেন?

অবাক হয়ে জবাব দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ-মা, তুমি কি বলছো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মীরা বলেছিলো-গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন আমি কার কথা বলছি।

সম্রাট অনুমান করতে পেরেছিলেন, তিনি বললেন-মা, তুমি জানো, বোঝ তবুও কেন ও কথা বলছো? আমি জানি একজন দস্যুকে তার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াই ন্যায়বিচার। দস্যু বনহুরকে কান্দাই সরকার কোনো রকমেই বন্দী করতে পারেনি, আর পারেনি বলেই আমার শরণাপন্ন হয়েছিলো।

এ সব আমি জানি পিতা। আরও জানি দস্যু হলেও বনহুর একজন দয়ালু দাতা। তার দানে বহু ক্ষুধার্ত মানুষ জীবনে বেঁচে আছে। আরও জানি তার দান সীমাহীন। যেখানেই দুঃস্থ মানুষ, নিপীড়িত জনগণ সেখানেই তার আবির্ভাব ঘটে থাকে। এহেন জীবন আপনাদের নষ্ট করা মোটেই সমীচীন হয়নি। পিতা, আপনি ভুল করেছেন, চরম ভুল কথাটা বলে মীরা বেরিয়ে গিয়েছিলো সেদিন।

একমাত্র কন্যাকে রাগান্বিত, ক্ষুব্ধ দেখে সম্রাট আবদুল্লাহ ভীষণ চিন্তিত হলেন। তার কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে ভাবতে লাগলেন। মীরা যা বললো তা সত্য বটে। কারণ আবদুল্লাহও জানেন, দস্যু বনহুর বড়ই হৃদয়বান। তার দয়ায় বহু নিষ্পেষিত নিপীড়িত মানুষ আজও ন্যায়বিচার পাচ্ছে। যারা অন্যায়, অত্যাচার, অসৎ তারাই সমুচিত শাস্তি পায়, এসব জানেন সম্রাট। তবুও তিনি কান্দাই সরকারের প্রস্তাবটি না মেনে নিয়ে পারলেন না। যেমন করে থোক দস্যু বনহুরকে বন্দী করে মিসরে নিয়ে আসা হবে এবং আর্মানহুডের গহ্বরে বন্দী করে রাখা হবে। যেন সে আর পালাতে না পারে। এটাই হবে তার জন্য চরম শাস্তি। সম্রাট আবদুল্লাহ কান্দাই সরকারের এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিপত্রে সই করেছিলেন।

আজ কন্যার অভিমান এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে সম্রাট আবদুল্লাহ বেশ চিন্তিত হলেন এবং গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন, একটি বিশেষ ব্যক্তিকে তারা ধ্বংস করেছেন, এ কথা সত্য। যত অপরাধীই হোক তবুও সে সবার প্রিয়জন ছিলো।

সম্রাট যতই ভাবেন ততই নিজকে দোষী মনে হয়। মীরা ঠিকই বলেছে, তিনি একজন দক্ষ ন্যায়বান বিচারক হয়ে কেমন করে এ ব্যাপারে সম্মতিদান করেছিলেন। কয়েক রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না, মীরা মাঝে মধ্যে পিতার বিশ্রামকক্ষে আসে কিন্তু তেমন করে কথা বলে না। এটা সম্রাট আবদুল্লাহর মনে দারুণ আঘাত করলো।

মিসরীয় সরকার এবং কান্দাই সরকার বনহুরকে চিরদিনের জন্য আমানহুডের গহ্বরে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

দেশব্যাপী এ সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লে এ সংবাদ। দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর গ্রেফতার হয়েছে, তাকে পিরামিড আর্মানহুডের অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখা হয়েছে, আর কোনোদিন সে উক্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে না।

এ সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। অনেকে বিশ্বাস করলো, অনেকে বিশ্বাস করতে পারলো না। খুশি হলো অনেকে, আবার দুঃখ পেলো অনেকে। যারা বনহুরের দয়ায় জীবন রক্ষা করতো সেই দিনমজুর, অনাথ, দুঃখী অসহায়রা কান্নায় ভেঙে পড়লো।

মিসরীয় ডাকু জঙ্গীশাহ এ সংবাদ শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হলো। দস্যু বনহুর চিরদিনের জন্য আমানহুডের গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে- এটা শুধু ডাকু জঙ্গী শাহর কাছেই সুসংবাদ নয়, আরও অনেকের কাছে শুভ সংবাদ হিসেবে পৌঁছলো। মিসরীয় নরশয়তান জঙ্গীশাহ এবং কান্দাইবাসী বাহাদুর সিং গডসের মধ্যে ছিলো গভীর যোগাযোগ। উভয়ে শক্তি-বলে সমান ছিলো। একে অপরের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতো।

বনহুরের বন্দী হবার সংবাদ গডসে ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিয়েছিলো জঙ্গীশাহকে। তবুও যখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং রেডিও-টেলিভিশনে জানতে পারলো দস্যু বনহুর আর পৃথিবীর বুকে নেই, তাকে বন্দী করার পর আর্মানহুডের অতল গহ্বরে বন্দী করে গরমুখ পাথর আর সিমেন্ট দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে, তখন

তার আনন্দ আর ধরে না। কান্দাই থেকে বনহুকে বন্দী করে বিশেষ একটি বিমানযোগে আনা হয়েছিলো মিসরে, তারপর তাকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমন একটা আনন্দ সংবাদে তারা আত্মহারা।

*

রাজকুমারী মীরার জন্ম উৎসব।

আজ মিসরীয়দের আনন্দ ধরে না। সমস্ত শহর ফুলে ফুলে সাজানো হয়েছে। আলোর ঝাড় জ্বলছে, রাজপথের মোড় মোড়ে নানা রঙের পতাকা আর বেলুন শোভা বর্ধন করছে। দালানকোঠা সব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

মিসরীয় বাদকগণ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে বসে গেছে। সুরের। ঝংকারে মেতে উঠেছে মিসরের আকাশ বাতাস।

রাজপ্রাসাদ আলোয় আলোময়।

মীরাকে সাজানো হচ্ছে। অপূর্ব রূপবতী মীরার সমস্ত শরীরে মণি-মাণিক্যের অলংকার পরানো হয়েছে। চারপাশে সখী পরিবেষ্টিত।

কিন্তু মীরা বিষণ্ন, গম্ভীর।

সেদিনের পর থেকে মীরা মনে স্বস্তি পাচ্ছে না। বনহুরকে সে দেখেছে একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ হিসেবে। তাকে দেখার পর হতে অহরহ ভেবেছে তার কথা, এমন এক লোককে মিসরীয়গণ কৌশলে বন্দী করলো, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা হয় না। মীরা দূর থেকে দেখেছে, তবুও মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনা বনহুরকে। একজন দস্যু তার মনকে এভাবে আলোড়িত করবে মীরা নিজেও ভাবতে পারেনি। যতই সে ভুলতে চেয়েছে ততই আরও গভীরভাবে দাগ কেটে বসেছে তার মনের গহনে-এমন একটা মানুষকে কি করে সমূলে ধ্বংস করে ফেললো এরা! মীরা যত ভাবে ততই কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়ে। বয়স তার একেবারে কম নয়, বেশ বুঝতে শিখেছে, ভাবতে শিখেছে। মিসরীয় সরকারের প্রতিটি কার্যকলাপে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। যে কাজ ভাল তাতে মীরার পূর্ণ সমর্থন আছে। যে কাজ মন্দ সে কাজে বলিষ্ঠভাবে সে প্রতিবাদ করে।

সম্রাট আবদুল্লাহ মন্দ লোক নন। তিনি বৃদ্ধ হলেও তার রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু তার একার মতে আজকাল কিছু করা সম্ভব নয়। তার পারিষদবর্গ আছে, বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রী আছে, তাদের মিলিত পরামর্শে কাজ করে থাকেন। অনেক সময় আবদুল্লার পছন্দ না হলেও তাকে সে কাজে স্বাক্ষর করতে হয়। বিশ্বখ্যাত দস্যু বনহুর, তাকে বন্দী করে চিরতরে পিরামিডের গহ্বরে আটক রাখার পরিকল্পনা যখন করা হয় সেই বৈঠকে সম্রাট আবদুল্লাহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। মিসরীয় মন্ত্রিগণই শুধু নয়, কান্দাই সরকার এবং বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ মিলে মিসরে গোপন বৈঠকে এ পরিকল্পনা করেন।

সম্রাট যতই গোপনে রাজ্যচালনার কাজ সম্পন্ন করুন না কেন, সবই অবগত ছিলো রাজকুমারী। অন্যায় কোনো কাজে তার পিতার সম্মতি থাকবে এটা বরদাস্ত করতে পারতো না সে। পিতার সঙ্গে মাঝে মধ্যেই মীরার তর্ক বিতর্ক হতো, যদিও মীরা জানতে পিতা অসৎ সম্রাট নন। তার প্রতিটি কাজে ছিলো ন্যায়নিষ্ঠা অথচ মাঝে মধ্যে তাকে ভুলপথে পরিচালনা করা হতো। যারা সম্রাট আবদুল্লাহকে ন্যায়পথ হতে বিচ্যুত করেন, তারা হলেন সম্রাটের পারিষদবর্গ এবং মন্ত্রীমহল।

মীরা নারী হলেও সব বুঝতো, কোটা অন্যায় আর কোনটা ন্যায়। এসব ব্যাপারে সব খেয়াল রাখতো। সে বনহুরকে বন্দী করার পূর্বে তাকে নিয়ে যে বৈঠক করেছিলো তা সব জানতো মীরা। যদিও সে সেদিন তেমন করে কোনো প্রতিবাদ করেনি তবুও তার মনে একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব বেধেছিলো। যাকে নিয়ে কান্দাই এবং মিসর সরকার এমনভাবে তোড়জোড় শুরু করেছে, যার জীবনকে ধ্বংস করার জন্য কৌশলে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, সেই মানুষটি সম্বন্ধে মীরা লোকমুখে অনেক কিছু শুনেছে। শুধু মন্দ, ভয়ংকর দিকটাই নয়, তার সুন্দর, পবিত্র চরিত্রের রূপটাও মীরার কাছে প্রকাশ পেয়েছিলো। আর সে কারণেই মীরা পারেনি এমন একটি মানুষকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার শলা-পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করতে। যখন মীরা মিসরীয় বিমান বন্দরে সম্রাট আবদুল্লাহর সঙ্গে গিয়েছিলো সেই ভয়ংকর মানুষটিকে একনজর দেখার জন্য, তখন তার মনে ছিলো নানা প্রশ্ন কিন্তু যখন তাকে স্বচক্ষে দর্শন করলো তখন অনাবিল আনন্দ আর তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিলো তার মন। কারণ যা সে ভেবেছিলো, কল্পনার চোখে যা কামনা করেছিলো বনহুর যেন তাই।

সেদিনের পর থেকে মীরার মনে বনহুরের প্রতিচ্ছবি ভাসছে। যতই সে মনে করে ওকে ভেবে তার লাভ কি। সে তো আর কোনদিন ফিরে আসবে না। একটিবার তাকে কোনদিন দেখতেও পাবে না পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ ঐ মুখটি।

আজ তার জন্মদিনে কেন যেন বারবার তার মনের আকাশে ঐ একটি মুখ ভাসছে। ঐ একটি বলিষ্ঠ পুরুষ, যার দুটি হাতে, মাজায় শিকল পরানো ছিলো। এত সঙ্গিন অবস্থায়ও তাকে এতটুকু বিমর্ষ বা ম্লান মনে হয়নি। দীপ্ত নীল দুটি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, প্রশস্ত ললাটে কোঁকড়ানো চুলগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে ছিলো। যতই ওর কথা ভাবে রাজকুমারী ততই যেন সে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আজ জন্মদিনে অতি মূল্যবান অলংকারে ভূষিত মীরা ভাবছে সেই প্রখ্যাত দস্যর কথা।

তাকে ঘিরে আনন্দ উৎসব চলছে।

রাজপ্রসাদের সামনে নানা ধরনের যানবাহন দন্ডায়মান আছে। স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ মিসরীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে আগমন করেছেন। রাজা মহারাজা সবাই আমন্ত্রিত।

সম্রাট আবদুল্লাহ জলসার আসরে বসেছেন। তার চারপাশ ঘিরে পারিষদবর্গ এবং মন্ত্রীমহল।

অন্তপুরে রাজকুমারী মীরাকে নিয়ে মহিলা মহল হাসি, গান আর আনন্দে আত্মহারা। সবাই বাদ্যের তালে তালে নৃত্যগীত পরিবেশন করছেন।

বিরাট প্রাসাদের এক অংশে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজকুমারীর জন্ম উৎসব, নানা ধরনের রাজকীয় খাদ্যসম্ভারে টেবিল ভর্তি। আমন্ত্রিত অতিথিগণ আসছেন, তাদের সসম্মানে বসানো হচ্ছে। ইচ্ছামত খাবার গ্রহণ করছেন তারা। আলোয় আলোকিত চারদিক।

মীরা তার সখীদের সহ সুউচ্চ আসনে বসে নর্তকীদের নৃত্যগান উপভোগ করছিলেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে আলো নিভে গেলো।

সমস্ত প্রাসাদ এবং আশেপাশের রাজপথ জমাট অন্ধকারে ভরে উঠলো। দু'চোখে কিছুই নজরে পড়ছে না।

হঠাৎ সখীদের মধ্যে আর্তচিৎকার শোনা গেলো।

বাঁচাও….বাঁচাও বাঁচাও….মীরার কণ্ঠস্বর, তাকে কেউ কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। কে সে ব্যক্তি কেউ জানে না। সমগ্র প্রাসাদে একটা ভয়ংকর আতংক ছড়িয়ে পড়লো।

অন্তপুরের আর্তচিৎকার শুধু সম্রাট আবদুল্লাহর কানেই পৌঁছলো না, যারা আসরে উপস্থিত ছিলেন তাদের সবার কানেই পৌঁছলো। ভীষণ জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন চারদিক। এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। অন্ধকারে নারীকন্ঠের চিৎকারধ্বনি সম্রাট আবদুল্লাহকে অস্থির করে তুললো। তিনি চিৎকার করে বললেন-আলো আলো, আলো নিয়ে এসো। সারা প্রাসাদে আলো জ্বেলে দাও..এ আর্তনাদ কার? কে আর্তনাদ করলো….

আর্তনাদ থেমে গেছে।

প্রাসাদের সামনে গাড়িগুলোর মধ্য হতে একটি গাড়ি স্টার্টের শব্দ শোনা গেলো। গাড়িখানা দ্রুত বেরিয়ে গেলো থেমে থাকা গাড়ির মিছিলের মধ্য হতে।

পরক্ষণেই আরও একটি গাড়ি ছাড়ার শব্দ শোনা গেলো। তারপর আলো জ্বলে উঠলো। ততক্ষণে সম্রাট এবং তার পারিষদবর্গ অন্তপুরে এসে উপস্থিত হলেন।

মীরার সখী এবং সহপাঠিগণ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।

একজন বললো–আমরা দেখেছি একটা লোক অন্ধকারে ছুটে এলো ভিড় ঠেলে। যেখানে মীরা বসেছিলো সেই জায়গায় এসে মীরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

অপর একজন বললো–অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক আমাদের ভিড় ঠেলে এসে মীরাকে কাঁধে তুলে নিলো, তারপর আমাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আমরা শুধু মীরার আর্তনাদ শুনতে পেলাম……

সবার একই কথা, মীরাকে কেউ কাঁধে তুলে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে চলে গেলো। তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে দুস্কৃতিকারী পালিয়েছে।

অনেকেই অনেক রকম কথা বলছে।

একজন বললো–একটি গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি গাড়ি ছাড়ার শব্দ আমরা শুনতে পেয়েছি। তাহলে একসঙ্গে দুটি গাড়ি মীরাকে নিয়ে পালিয়েছে।

সম্রাট ধপ করে একটা আসনে বসে পড়লেন। তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন যেন। একমাত্র কন্যা মীরা, বছর বছর তার জন্মাৎসব মহা ধুমধামে পালন করা হয়। বহু আনন্দ উৎসব, খানা পিনা, দীন-দুঃখীদের দান-ধ্যান অনেক কিছু চলে। অনেক জ্ঞানীগুণী-পন্ডিতের আগমন ঘটে কিন্তু এমন তো হয়নি কোনোদিন। এবার মিসরীয় সম্রাট কন্যার ভাগ্যে এই ছিলো। সম্রাট আবদুল্লাহ মাথায় কষাঘাত করতে লাগলেন।

সারা মিসরে ছড়িয়ে পড়লো কথাটা বিদ্যুৎগতিতে। এমন কান্ড ঘটবে কেউ ভাবতে পারেনি। সম্রাটকন্যা অপহৃত হয়েছে এ যেন এক বিস্ময়। কে তাকে হরণ করলো কেউ খোঁজ পেলো না। প্রাসাদের প্রহরিগণ যেন সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

যখন সবাই আনন্দে আত্মহারা। প্রাসাদের চারদিকে আলো ঝলমল করছে, অন্তপুরে মীরাকে নিয়ে সখীরা নৃত্যগীতে মাতোয়ারা। ওদিকে সম্মানিত অতিথিগণ আমোদ আহ্লাদে মেতে আছে। অপরদিকে চলছে খানাপিনা, ঠিক সেই মুহূর্তে আলো নিভে গেলো। সমস্ত রাজপ্রাসাদ অন্ধকারে ভরে উঠলো। সেই মুহূর্তে জমকালো পোশাক পরিহিত এক লোক অন্তপুরে প্রবেশ করে ঠিক মীরার আসনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। চিৎকার করে উঠলো সখিগণ। আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত এবং সঙ্গীতের সুর থেমে গিয়েছিলো। জমকালো পোশাকধারী লোকটার আবির্ভাবে ভীত-আতঙ্কিত সখীগণ ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করছিলো, ঐ সময় সে মীরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মুহূর্তে উধাও হলো।

মীরার আর্তনাদ বাঁচাও বাঁচাও শব্দ সবার কানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিগণ এবং উপস্থিত সকলে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কেউ ভেবে পাচ্ছে না, কি ঘটলো।

তারপর যখন আলো জ্বলে উঠলো তখন সবাই দেখলো মীরা নেই। কে বা কারা মীরাকে তুলে নিয়ে গেছে তার সখীদের বেষ্টনী ভেদ করে।

সম্রাট আবদুল্লাহ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন, যাও তোমরা দেখো কোথায় আমার মীরা। রাজ-পারিষদগণ এবং মন্ত্রীমহলও ছুটলো

যে যার গাড়ি নিয়ে, কোথায় মীরার সন্ধান পাওয়া যায়।

মীরাকে যখন গাড়িতে তুলে নেওয়া হয় তখন অপর আর একটি গাড়ি সেই গাড়িখানাকে অনুসরণ করেছিলো।

মীরাসহ গাড়িখানা উষ্কাবেগে ছুটে চললো। দুস্কৃতিকারী বুঝতে পেরেছিলো কেউ তাকে ফলো করছে। কিন্তু কে সে, আর সেই ব্যক্তি জানলো কি করে যে, মীরা তার জন্মদিনে অপহৃত হবে। গাড়ি চালাচ্ছে দুষ্কৃতিকারী এবং ভাবছে ব্যাপারটা। গাড়িতে মীরাকে ভুলে নেওয়ার পরপরই গাড়ি নিয়ে রাজপথে নেমেছে সে, ঐ মুহূর্তেই অপরগাড়ি তার গাড়িখানাকে লক্ষ্য করে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

উল্কাবেগে ছুটছে গাড়ি দু'খানা।

মীরার মুখে রুমাল বাঁধা হয়েছে তাই সে চিৎকার করতে পারছে না। চিৎকার করেই বা লাভ কি, জনশূন্য রাজপথ। কেউ মীরার আর্তচিৎকার শুনতে পাবে না। পথের দু'পাশে যে সব ইমারত ঘুমন্ত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে তারাও শুনবে না মীরার চিৎকার। বড় অসহায় এ মুহূর্তে মীরা।

মীরাকে পেছন আসনে একজন ধরে রেখেছে।

অপরজন গাড়ি চালাচ্ছে।

ওদের দুজনার শরীরেই জমকালো পোশাক। ড্রাইভ আসন থেকে দুস্কৃতিকারী বারবার তাকাচ্ছে পেছনে ছুটে আসা গাড়িখানার দিকে। পথের দু'ধারে লাইট পোষ্টগুলোর আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পেছন গাড়িতে শুধু এক ব্যক্তিই রয়েছে। তাকে কাবু করা ওদের পক্ষে সহজ।

প্রথম গাড়িখানা এবার রাজপথ ছেড়ে মেঠোপথ ধরে ছুটলো। দুস্কৃতিকারিগণ ভাবলো উঁচুনীচু পথে পেছনের গাড়িখানা আর তাদের গাড়িখানাকে অনুসরণ করবে না। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা ঠিক হলো না, দ্বিতীয় গাড়িখানা তাদের গাড়িখানাকে লক্ষ করে মেঠো পথেই নেমে পড়লো। দুস্কৃতিকারী আরও স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

এলোপাতাড়ি ছুটতে লাগলো গাড়িখানা।

দ্বিতীয় গাড়িখানাও ঠিক সেভাবে এগিয়ে আসছে। বহু দূর চলে এলো গাড়ি দুখানা। অদূরে মিসরীয় পর্বতমালা। ঝোঁপ-ঝাড় জঙ্গলে ভরা। পর্বতমালার পাদদেশ ধরে গাড়ি দুটো ছুটছে।

কোনো পথ নেই, শুধু ঝোঁপঝাড়, ছোট ঘোট পাথর আর টিলা।

দ্বিতীয় গাড়িখানা এক সময় প্রথম গাড়ির পথ রোধ করে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো দুস্কৃতিকারীদ্বয়। তাদের একজনের হাতে রিভলভার।

দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভ আসন থেকেও চালক নেমে পড়লো।

শুরু হলো তুমুল লড়াই।

অপর ব্যক্তি রিভলভার বাগিয়ে ধরলো দ্বিতীয় গাড়ির চালককে লক্ষ্য করে। প্রথম ব্যক্তি আক্রমণ চালিয়ে ওকে কাবু করার চেষ্টা করছে। বলিষ্ঠ জোয়ান লোক, শরীরে জমকালো পোশাক। এ ব্যক্তিই মীরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ভেগেছিলো।

এ মুহূর্তে যাকে সে কাবু করার চেষ্টা করছে সেও শক্তিশালী কম নয়। ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হলো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি গুলী ছোঁড়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

রাত ভোর হয়ে এসেছে।

পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে লাল সোনালী আলো।

মীরার হাত-পা মুক্ত ছিলো। সে একটানে মুখের বন্ধন মুক্ত করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। ছুটতে লাগলো সে পর্বতমালা লক্ষ্য করে। কোনোক্রমে পর্বতমালার উপরে উঠতে পারলে সে ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করবে।

রিভলভারখানা তা লক্ষ করলো এবং তার দিকে ছুটলো। মীরাও ছুটছে, রিভলভার ধারীও ছুটছে। ওদিকে মল্ল যুদ্ধ হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় গাড়ির চালকের মধ্যে।

দ্বিতীয় গাড়ির চালক দেখলো রাজকন্যা মীরা ছুটছে পর্বতমালা লক্ষ্য করে। উঠছে আর পড়ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে তবুও দৌড়াচ্ছে সে। রিভলভারধারী তাকে ধরার জন্য পেছন পেছন ছুটছে।

একসময় ধরে ফেললো মীরাকে।

মীরা আর্তচীৎকার করে উঠলো।

দ্বিতীয় গাড়ির চালক ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তির চোয়ালে প্রচন্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে ছুটলো ঐদিকে, যেদিকে মীরাকে রিভলভারধারী ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

ছুটে এসে ধরে ফেললো রিভলভারধারীকে। একটানে মীরার হাত থেকে ওর হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণ হাতখানা মোচড় দিয়ে ধরলো। যেন সে রিভলভার চালাতে না পারে। ওর হাতখানা এমন জোরে মুচড়ে ধরলো যে, হাত থেকে রিভলভারখানা খসে পড়লো।

চালক হাতের মুঠায় ওর দক্ষিণ হাত চেপে ধরে পা দিয়ে রিভলভার ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দূরে পর্বতমালার পাদদেশে ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্যে। ওটা সহজে খুঁজে পাবার উপায় নেই।

ততক্ষণে প্রথম গাড়ির চালক ধুলাবালি ঝেড়ে উঠে এগিয়ে এলো। সেও আক্রমণ করলো দ্বিতীয় গাড়ির চালককে।

দ্বিতীয় গাড়ির চালক মীরাকে সরিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের দুজনের ওপরে। সে একা আর ওরা দুজন চললো ভীষণ লড়াই। একজনকে ঘুষি লাগিয়ে আবার অপর জনকে আক্রমণ করে। তারাও শক্তিশালী কম নয়। তারাও লাগাচ্ছে ওকে, কিন্তু দ্বিতীয় গাড়ির চালকের সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল হলো তাদের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবু হয়ে পড়লো দ্বিতীয় গাড়ির চালক ও তার সঙ্গী।

এবার ওরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় গাড়ির চালক বুঝতে পেরে দুহাতে ওদের দুজনের জামার কলার চেপে ধরলো, তারপর পা দিয়ে দু'জনের তলপেটে প্রচন্ড আঘাত করলো।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ওরা দুজন। একজন উঠে পড়ে ছুটলো গাড়ি লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় গাড়ির চালক অপর লোকটিকে গলা ধরে টেনে তুললো এবং বজ্রমুষ্ঠি বসিয়ে দিলো তার চোয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। হাতের পিঠে রক্ত মুছে নিয়ে সেও ছুটে গেলো তাদের গাড়ির দিকে।

ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে তার সঙ্গীচালকের আসনে। অপরজন গিয়ে বসতেই গাড়ি ছাড়লো। এলোপাতাড়ি গাড়ি নিয়ে ছুটলো ওরা, মীরাকে ছেড়েই পালিয়ে প্রাণ বাচালো।

এবার দ্বিতীয় গাড়ির চালক ফিরে তাকালো মীরার দিকে।

মীরাও বিস্ময়কর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে, কে এই ব্যক্তি যে তাকে এভাবে রক্ষা করলো, তার ইজ্জত মান সম্মান রক্ষা করলো।

মীরা তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না কারণ তার মুখের নিচের অংশ কালো রুমালে ঢাকা। মাথায় মিসরীয় ক্যাপ। পায়ে মিসরীয় ভারী বুট। শরীরে ওভারকোট জাতীয় কোট।

চালক মীরার সন্নিকটস্থ হয়ে বললো–রাজকুমারী, সালাম গ্রহণ করুন। চলুন এবার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মীরা বললো–কে আপনি? কি আপনার পরিচয়?

চালক বললো–আমি একজন পথিক। রাজকুমারী এসেছিলাম সম্রাটকন্যার জন্ম উৎসব উপভোগ করার জন্য। ঐ মুহূর্তে যা দেখলাম তখন নিশ্চুপ থাকতে পারলাম না, তাই পরের ঘটনা সবই আপনার সামনে ঘটলো, কাজেই আর কিছু আপনার জানার বাকি নেই। চলুন, গাড়িতে বসুন।

মীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো, এ কণ্ঠস্বর সে পূর্বে কোনোদিন শোনেনি। কে এই মানুষ ভেবে পায় না সে।

গাড়িতে বসবার পূর্বে বললো–আপনি যেই হোন না কেন, একবার আপনি আপনার মুখের আচ্ছাদন উন্মোচন করুন। কালো রুমালখানা খুলে ফেলুন।

চালক হেসে বললো–রাজকুমারী, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আপনি গাড়িতে বসুন, আপনাকে শহরে পৌঁছে দেবো।

কেন, আমার পিতার কাছে আমাকে পৌঁছে দেবেন না?

আপনার নিশ্চয়ই ড্রাইভ জানা আছে?

আছে। তবুও আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনি আমাকে দুস্কৃতিকারীদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। আমার পিতা আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো চালক, বললো সে-সবাই কি পুরস্কারের আশা নিয়ে কোনো কাজে এগিয়ে আসে?

না, আমি ঠিক তা বলছি না। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার হীরার হার আপনাকে আমি দিচ্ছি, গ্রহণ করুণ। কথাটা বলে মীরা নিজকণ্ঠ থেকে হীরার হার খুলতে গেলো।

চালক বললো–ওসবের কোনো প্রয়োজন নেই। চলুন এবার গাড়িতে বসুন।

সত্যি আপনি কত মহৎকথাটা বলে মীরা গাড়িতে চেপে বসলো। ড্রাইভ আসনের পাশেই বসলো সে।

চালক ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

মীরা চালকের কালো রুমালে ঢাকা মুখটির দিকে তাকিয়ে বললো–এবার, যারা আমাকে প্রাসাদের অন্তপুর থেকে তুলে এনেছিলো তারা নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের লোক।

চালক বললো–সত্যিই বলেছেন। দস্যু বনহুরের লোক ছাড়া কার এমন সাধ্য আপনাকে প্রাসাদের অন্তপুর থেকে তুলে নিয়ে আসে। নিশ্চয়ই তারই ক্রুদ্ধ অনুচরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে এ কাজ করেছে।

কিন্তু বনহুরকে আমি নিজের চোখে দেখেছি, যদিও সে একজন প্রখ্যাত দস্যু তবুও তার মধ্যে আমি দেখেছি এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষকে।

আবার চালক হাসলো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–আপনার চোখে সে হয়তো একজন অসাধারণ পুরুষ হিসেবে ধরা পড়েছে কিন্তু আসলেই কি সে একজন সব্যক্তি যদি সৎ বা মহৎ ব্যক্তিই হতো তাহলে তাকে নিঃশেষ বা ধ্বংস করার জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো না।

বললো মীরা–আমার মন বলছে সে ভাল ও সৎ যা আমি পূর্বে শুনেছি।

এতই যদি তার ওপর আপনার বিশ্বাস তবে কেমন করে ভাবতে পারলেন আপনাকে যারা চুরি করে নিয়ে এলো তারা দস্যু বনহুরের অনুচর।

সে মহৎ হলেও তার দলবল সৎ ও মহৎ হবে তা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ আমার পিতা বনহুকে আমানহুডের অভ্যন্তরে আটক করার ব্যাপারে কান্দাই ও মিসরীয় সরকারকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

আর সে কারণেই বনহুরের অনুচরগণ আপনাকে এভাবে চুরি করার পরিকল্পনা করেছিলো…

ভাগ্যিস আপনি আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর সে কারণেই এ যাত্রা রক্ষা পেলাম।

ওরা মিসরীয় ভাষায় কথাবার্তা বলছিলো।

চালকটির মুখে কালো রুমাল বাঁধা, দেহে মিসরীয় পোশাক। কথাবার্তা মিসরীয় ভাষায় বলে সে। গাড়ি চালনায় সে দক্ষ বটে। গাড়ি চালাচ্ছিলো এবং রাজকুমারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলো। দুর্গম পথে গাড়ি চালাতে তার তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। পথ ঠিক নয়, উঁচুনীচু টিলাময় প্রান্তর। আর সেই প্রান্তর পেরিয়ে তাদের যেতে হবে শহরে। একপাশে পর্বতমালা আর ঝোঁপঝাড়,

অপর দিকে প্রান্তর। সুদীর্ঘ প্রান্তর পেরিয়ে তারা এসে পড়েছে। চালক অতি সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছিলো এবং মাঝে মাঝে কথা বলছিলো মীরার সঙ্গে।

মীরা ভাবছিলো চালকটির কথা। কে এই ব্যক্তি যার বীরত্ব তাকে শুধু হতবাক বিস্মিতই করেনি, করেছে অভিভূত। শুধু শক্তিতেই সে ওদের দুজনকে পরাজিত করেনি বুদ্ধিমত্তাতেও হার মেনেছে ওরা। শেষ পর্যন্ত পালাতে ওরা বাধ্য হলো।

কি বলে যে ধন্যবাদ দেবে সে ভেবে পেলো না। কালো রুমালের আড়ালে কেমন একটা মুখ আছে জানে না মীরা, তবুও সে কল্পনায় একটা সুন্দর বলিষ্ঠ মুখ চিন্তা করছে। তার খুব দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু উপায় কোথায়।

*

সম্রাট আবদুল্লাহ কন্যাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। কন্যার আগমনে মিসরীয় নাগরিকগণও দুশ্চিন্তামুক্ত কিন্তু তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, রাজকুমারীর জন্মদিনে তাকে রাজবাড়ি থেকে কে বা কারা হরণ করেছিলো। প্রথমে সবাই মনে করেছিলো মীরার শরীরে বহুমূল্যবান অলংকার থাকায় তাকে দুস্কৃতিকারিগণ হরণ করেছে, কিন্তু যখন সে নিরাপদে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সব অলংকার পরিহিত অবস্থায় ফিরে এলো তখন সবার মনে নানা ধরনের প্রশ্নের উদয় হতে লাগলো।

কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব কেউ পেলো না। রাজপরিবারের সবকিছু খুঁটিয়ে জানা সম্ভবও নয় তাদের। তবুও এক একজন এক এক রকম মন্তব্য করতে লাগলো মীরাকে নিয়ে।

সম্রাট নিজেও অবাক হয়েছেন, তিনি যখন কন্যার জন্য ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত, কান্নাকাটি করছেন; পারিষদবর্গ যখন তাকে সান্তনা দিচ্ছেন, চারদিকে রাজকন্যা মীরার সন্ধানে রাজকর্মচারিগণ হন্যে হয়ে ছুটাছুটি করছে, ঠিক সেই সময় ফিরে এলো মীরা নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে।

মীরা গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এসে পিতার গলা জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। কিছুতেই যেন তার কান্না থামতে চায় না। সমস্ত ভাষা যেন তার কান্না হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

সম্রাট আবদুল্লাহ নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না, তিনিও অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এ কান্না ব্যথা-বেদনা আর আনন্দ মেশানো কান্না।

সম্রাট আবদুল্লাহ কন্যাকে সস্নেহে বললেন-মা, হঠাৎ এভাবে তোমাকে কারা তুলে নিয়ে গিয়েছিলো? তারা কারা? বলো মা, আমি তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

মীরা আঁচলে চোখ মুছে বললো–পিতা, আমাকে যারা হরণ করেছিলো তারা নরপশু শয়তান। আমাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু কে একজন তাদের গাড়ির পেছনে গাড়ি চালিয়ে ধাওয়া করে

তারপর কি হলো মা মীরা? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সম্রাট আবদুল্লাহ। তার চোখেমুখে ব্যাকুলতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

বললো মীরা–তিনি দুস্কৃতিকারীদের গাড়িটিকে অনুসরণ করছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী ব্যক্তি। ঐ গাড়িখানা এলোপাতাড়ি বালুকাময় প্রান্তরে, তারপর উঁচুনীচু টিলাযুক্ত অসমতল ভূমিতে এমনভাবে চালালো যেন পেছনের গাড়ি কিছুতেই তাদের ধরতে না পারে। কিন্তু পেছনের গাড়ির চালক দক্ষতার সঙ্গে তাদের গাড়িখানাকে অনুসরণ করছিলো। যদিও আমার মুখে রুমাল খুঁজে দেওয়া হয়েছিলো তবুও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ড্রাইভ আসনে যে বসে গাড়ি চালাচ্ছিলো সে বারবার পেছনে ফিরে দেখছিলো তার মুখোভাবে একটি উৎকণ্ঠাভাব ফুটে উঠছিলো।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো মীরা।

সম্রাট আবদুল্লাহর দু'চোখে বিস্ময় ও আতংকতরা করুণ একটা ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুনে যাচ্ছেন কন্যা মীরার কথা। ঢোঁক গিলে বললেন তিনি-মা, তুমি এমন অবস্থায় পড়েছিলে।

হ্যাঁ পিতা, আমি ভাবতে পারিনি কোনোদিন কোনো শয়তান আমাকে এভাবে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাবে। সত্যি বলতে কি পিতা, আল্লাহ পাকের রহমতে যিনি পেছনে গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করেছিলেন তিনিই আমাকে সেই নরশয়তানদের কবল থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনেছেন। আমার কোনো ক্ষতি তারা করতে পারেনি।

মা, তোমাকে তো একা দেখছি-কোথায় তিনি, যিনি তোমাকে এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছেন?

তিনি এক অদ্ভুত মানুষ। আনমনা হয়ে যায় মীরা, তারপর বললো সে-আমি তার মুখমন্ডল দেখার জন্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি।

এ তুমি কি বলছো মীরা।

হ্যাঁ পিতা, তার মুখ আমি দেখতে পাইনি। তার মুখে একটি কালো রুমাল বাঁধা ছিলো। তাই তার মুখমন্ডল দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যখন তিনি শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছিলেন তখনও তার মুখমন্ডলের অর্ধেকাংশ কালো রুমালে ভালোভাবে বাঁধা ছিলো যার জন্য আমি শত চেষ্টা করেও তার মুখ দেখতে পাইনি। আশ্চর্য, শত্রুর সাথে লড়াইয়ের সময়ও তার মুখের কালো রুমালখানা এতটুকু শিথিল হয়নি বা খসে পড়েনি।

এসব কি বলছো মীরা?

যা সত্য তাই বলছি। বললো মীরা।

আবদুল্লাহ বললেন-মা, তোমাকে উদ্ধার করার পর যখন তিনি গাড়িতে নিয়ে এলেন তখনও কি তার মুখমন্ডলে আচ্ছাদন ছিলো?

হ্যাঁ। আমি তাকে বারবার তার মুখের রুমাল খুলে ফেলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। তবুও তিনি মুখের আবরণ উন্মোচন করেননি। এ ছাড়াও তিনি আমাকে শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেননি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি গাড়ি চালাতে পারেন কিনা। আমি বলেছিলাম, পারি। আর সে কারণেই তিনি পথে নেমে গেলেন এবং আমাকে......।

তোমাকে বিপদমুক্ত না করেই তিনি কি করে একা ছেড়ে দিলেন। যিনি জানেন তোমার একা ফিরে আসা খুবই বিপদজনক।

পিতা, তিনি আমাকে একা ছেড়ে দিলেও আমি লক্ষ করেছি একটি মোটর সাইকেল দূর থেকে আমার গাড়িকে লক্ষ করে এগিয়ে এসেছে।

তবে কি তুমি মনে করে সেই ব্যক্তিই তোমাকে......

হা পিতা, সেই মহান ব্যক্তিটি আমাকে প্রকাশ্যে প্রাসাদে পৌঁছে না দিলেও তিনি সবার অলক্ষ্যে প্রাসাদ পর্যন্ত এসেছিলেন।

বলছো কি মা!

পিতা, বড় অদ্ভুত লোক সেই ব্যক্তি যার মুখ আমি দেখিনি। জানি না কে তিনি। মিসরবাসীই কেউ হবেন, যিনি আপনাকে শ্রদ্ধা করেন, আর সেই কারণেই তিনি আমার ঐ বিপদ মুহূর্তে এগিয়ে এসেছিলেন আমাকে রক্ষা করতে, আমার ইজ্জত বাঁচাতে.....।

আবদুল্লাহর চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠলো, তিনি কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন-আমি তাকে পুরস্কৃত করবো মীরা। যা চাইবে তাই তাকে দেবো। আমার রাজ্যের একমাত্র তুমিই অধিশ্বরী, কাজেই যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে তোমার ইজ্জত রক্ষা করেছেন, আমার মান-সম্মান রক্ষা করেছেন তিনি শুধু মহৎ নন, একজন নেতা হবার যোগ্য ব্যক্তি।

কন্যার কথায় সম্রাট আবদুল্লাহর মন পুলকিত হয়ে উঠলো। তিনি পারিষদগণকে ডেকে বললেন-আপনারা ঘোষণা করে দিন যিনি আমার কন্যা মীরাকে শকবল থেকে রক্ষা করে প্রাসাদে ফিরিয়ে এনেছেন তাকে আমি দেখতে চাই এটা আমার বড় আশা, বাসনা।

সম্রাট আবদুল্লাহর আদেশে রাজ্যে তা ঘোষণা করে দেওয়া হলো।

*

বনহুর অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুনলো শব্দটা কিসের, আর কোন দিক থেকে আসছে। শব্দটা যে আর্মানহুডের ভেতর থেকে বা ওদিক থেকেই আসছে তাতে কোনো ভুল নেই। বনহুর আবার ফিরে এলো আর্মানহুডের মধ্যে। ততক্ষণে শব্দটা থেমে গেছে, বনহুর বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ফিরে এলো শবাধারের পাশে। কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর লোমশদেহীর রক্ষিত সেই শিকড়গুলো বের করে নিলো হাতে। এরপর শবাধারের ঢাকনা খুলে ফেললো। কিছুক্ষণ নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে রইলো সে, অবাক লাগছে, সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও মেয়েটির চেহারায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বা এতটুকু মলিন হয়নি, অনন্য সুন্দরী বলা যায়। লোমশদেহীর ওষুধের গুণাগুণ সত্যি বড় আশ্চর্য!

বনহুর সেই শিকড় হাতের তালুতে রগড়ে রস বের করে শবাধারের তরুণীর মুখ হা করিয়ে তা ঢেলে দিলো, তারপর অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো, তার মনেও

বিরাট আশা নিশ্চয়ই এ রস দ্বারা সেও তরুণীকে জীবিত করতে পারবে।

কয়েক মিনিট কেটে গেলো কিন্তু......

বনহুর অধীর হয়ে উঠছে। তবে কি সে বিফল হবে?

আরও কয়েক মিনিট কাটলো।

বনহুর পায়চারী করছে।

হঠাৎ একটা শব্দ। বনহুর ফিরে তাকাতেই তার মুখমন্ডল আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠলো। শবাধারে তরুণীর দেহে জীবন ফিরে এসেছে অর্থাৎ সংজ্ঞা ফিরে এসেছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তরুণীকে তুলে বসিয়ে দিলো।

তরুণী অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। বনহুরকে দেখে সে যে ভীষণ আশ্চর্য হয়েছে তা তার মুখ দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

বনহুর কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত, হতবাক হয়ে গেলো, সহজে মেয়েটির সংজ্ঞা ফিরে আসবে। সে ভাবতেই পারেনি। এ যেন একটা আশ্চর্য ঘটনা। তবে হ্যাঁ, ঠিক লোমশদেহী যেমনভাবে ঐ শিকড়ের রস বের করে তরুণীর মুখগহ্বরে ঢেলে দিয়েছিলো ঠিক তেমনি করেই বনহুর তার চিবুক হা করে মুখের মধ্যে রসটুকু ঢেলে দিয়েছিলো। মেয়েটি দু'চোখ মেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। বনহুর ওর দিকে হাত বাড়িয়ে মিসরীয় ভাষায় বললো–এসো, বেরিয়ে এসো....

তরুণী কোনো কথা না বলে বনহুরের হাতের ওপর হাত রাখলো। নেমে এলো সে শবাধারের ভেতর থেকে।

বনহুর বললো–আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি মানুষ।

তরুণী দীর্ঘকাল ধরে লোমশদেহীকে দেখে এসেছে, তাই তার দৃষ্টিতে স্বাভাবিক চেহারার মানুষ আশ্চর্য লাগছে। কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো

তরুণী, তারপর বললো–তুমি এখানে এলে কি করে? এটা তো আমার কবর।

বনহুর বেশ খুশি হয়েছে। কারণ, তার আশা পূর্ণ হয়েছে। লোমশদেহীর ওষুধ কাজে লেগেছে। তরুণী সেই ওষুধ পান করে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে। বনহুর ভাবছে এটা শুধু বিস্ময় নয়, একেবারে অলৌকিক ব্যাপার। বনহুরের অভিজ্ঞতা অনেক রয়েছে কিন্তু এ ধরনের ঘটনা তার জীবনে কখনো ঘটেনি। তার সামনে দন্ডায়মান হাজার হাজার বছর পূর্বের একটি মানুষ, যার মৃত্যু ঘটলে তার অস্থি-পাঁজর এতদিন মাটির সঙ্গে মিশে মাটি হয়ে যেতো। কিন্তু শুধুমাত্র ওষুধের গুণে আজও সে জীবিত আছে। শুধু তাই নয়, তার দেহ আজও নব যৌবনে ভরা, দীপ্ত সুন্দর দুটি চোখে নির্মল মায়াময় চাহনি। গন্ডদেশ ঈষৎ রক্তাভ, ওষ্ঠদ্বয় লাল, সরু। ভ্রমর কালো চুল। কোথাও এতটুকু পরিবর্তনের ছাপ নেই। অবাক চোখে বনহুর ওকে দেখছে।

তরুণী বললো–আমার দিকে তাকিয়ে অমন করে কি দেখছো?

বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো–তোমাকে দেখছি ডমীলু।

তরুণী বললো–আমাকে দেখছো?

হ্যাঁ।

একদিন মাংসিয়াংতুও তোমার মত করে বলতো, অবশ্য এখনও সে বলে।

বনহুর আরও সহজ হবার চেষ্টা করে বললো–তুমি তাকে ভালবাস?

মোটেই না। তাকে আমি কোনোদিন ভালবাসিনি, আজও বাসি না। কেন যে সে আমার পিছু লেগে রয়েছে আমি বুঝতে পারি না। ওকে আমি সহ্য করতে পারি না। আমি মুক্তি চাই ওর কাছ থেকে...।

বনহুর বললো–ডমীলু, তোমার জন্য সে অনেক কিছু করেছে। আজও সে তোমাকে জীবিত রেখেছে। নইলে এতদিন তোমার দেহের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকতো না।

তাও আমার জন্য অনেক ভাল ছিলো আগন্তুক। তুমি জানো না আমার কত দুঃখ। ঐ শয়তানটিকে আমি খুন করতাম কিন্তু আমি অসহায়।

তোমার জন্য সে এত করেছে আর তুমি তাকে খুন করে ফেলতে।

হ্যাঁ।

বনহুর আর ডমীলু মিসরীয় ভাষায় কথা বলছে। বনহুর ডমীলুকে একটি উঁচু পাথরখন্ডে বসিয়ে নিজেও তার পাশে বসলো। পৃথিবীর বুকে সে বহু নারী-পুরুষ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে কিন্তু এমন একটি বিস্ময়কর নারীর কাছাকাছি আসার সুযোগ তার জীবনে এই প্রথম। তবে একবার মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার সুযোগ সে পেয়েছিলো, যেখানে সী আর মৌ তার কাছে ছিলো বিস্ময়। অদ্ভুত সে দেশ, অদ্ভুত সে দেশের বৃক্ষলতা গুল্ম, তেমনি বিস্ময়কর ছিলো সেই দেশের মানুষ। আজও বনহুরের মনে দাগ কেটে আছে সী আর মৌ। মাঝে মাঝে ভাবে সে। ওদের কথা, তখন কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়।

মিসরের পিরামিড আর্মানহুডের গহ্বরে তেমনি আজ তাকে বিস্মিত করেছে শবাধারের জীবন্ত এ মেয়েটি।

বনহুর বললো–ডমীলু।

তুমি আমার নাম কেমন করে জানলে আগন্তুক চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে বললো ডমীলু।

বনহুর একটু হেসে বললো–তোমার ভালবাসার জন্য যে আজও তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তারই কাছে শুনেছি তোমার নাম।

মাংসিয়াংতু তোমাকে আমার নাম বলেছে?

সে যখন তোমার নাম উচ্চারণ করছিলো তখন আমি শুনেছিলাম। সত্যি ডমী, মাংসিয়াংতু তোমাকে বড় ভালবাসে।

সে কথা তোমাকে বলতে হবে না আগন্তুক। ওটা বড় পুরানো কথা। আমার বাবা মিসরীয় সম্রাট আহমদুল্লাহ সৎ-মহৎ নেতা ছিলেন। তাকে সরল পেয়ে অনেকেই তার চরম সর্বনাশ করেছিলো, এমন কি তার পারিষদবর্গও তাকে ধোকা দিয়ে তার জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো। আমার বাবা খুব মহৎ ছিলেন....কথা বলতে বলতে আনমনা হয়ে যায় ডমীলু। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো সে-তুমি আমাকে আমার বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারো?

ওর কথা শুনে অবাক হলো বনহুর, বেশ বুঝতে পারলো ডমীলু ভাবছে তার বাবা আজও জীবিত আছে। মাংসিয়াংতু তাকে এই পিরামিডে বন্দী করে রেখেছে। সে ফিরে যেতে চায় তার বাবা সম্রাট আহমদুল্লার কাছে। জানে না ডমীলু তাকে কতদিন এখানে জীবন্ত করে রাখা হয়েছে। বনহুর বুঝেও না বোঝার ভান করে বললো–আমি একটি অজানা লোক। আমার সঙ্গে তুমি যাবে?

যাবো।

তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তোমার সুন্দর চেহারা আমাকে অভিভূত করেছে। আমার মন বলছে ভুমি ভাল মানুষ।

ডমীলুর কথাগুলো বড় মিষ্টি, যদিও সে একালের মেয়ে নয় তবুও তার রূপলাবণ্য বড়ই আকর্ষণীয়। যখন সে কথা বলছিলো তখন তার সুন্দর মুখমন্ডল রক্তাভ মনে হচ্ছিলো। বনহুর একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো এবং কথাগুলো শুনছিলো মনোযোগ সহকারে। সম্রাট আহমদুল্লাহ তার কন্যার নাম পছন্দ করে রেখেছিলেন ডমী, মিসরীয় ভাষায় ডমীলু মানে, জোছনার আলো। বনহুর বললো–আমাকে তুমি তাহলে বিশ্বাস করো ডমীলু?

হ্যাঁ, তোমাকে আমি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করেছি। বড় ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। তোমাকে। আমাকে নিয়ে যাবে আমার বাবার কাছে জানো আমার বাবা তোমাকে খালি হাতে ফেরাবেন না। ধনদৌলত-মণি-মাণিক্য যা চাইতে তাই তিনি দেবেন। তার রাজ্যে কোনো অভাব নেই।

কিন্ত…বনহুর কিছু বলতে চাইলো।

তরুণী তার বলার পূর্বেই বললো–মাংসিয়াংতুকে আমি বহুবার বলেছি কিন্তু সে আমার কথায় কান দেয়নি। আমাকে হারিয়ে আমার বাবা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা ঐ শয়তান আমাকে বলেছিলো তবুও সে দয়া করেনি। আমার বাবাকে একটি বার যদি তুমি দেখতে তাহলে বুঝতে তিনি কত মহৎ। তুমি কি চাও আগন্তুক?

যদি বলি তোমাকে চাই। বনহুর তরুণীর মন পরীক্ষা করার জন্য কথাটা বললো।

তরুণী কথাটা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

অদ্ভুত সে হাসি।

বনহুর এমন হাসি কোনোদিন যেন শোননি। তরুণীর সংজ্ঞা ফিরে আসার পর হতে অনেক কথাই হলো দু’জনের মধ্যে কিন্তু আশ্চর্য, তরুণী একটি বারও হাসেনি। একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব নিয়ে সে কথা বলছিলো। হঠাৎ হাসির বন্যা ছড়িয়ে পড়ে তরুণীর কণ্ঠস্বরে। হাসি থামিয়ে বললো তরুণী-মাংসিয়াংতুর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বাবা বলেছিলেন, মাংসিয়াংতু, তুমি কি চাও আমার কাছে যা চাইবে তাই আমি দেবো তোমাকে। জানো, বাবার কথায় সেই শয়তানটা কি জবাব দিয়েছিলো? জানো না, আর তুমি তা জানবে কি করে। মাংসিয়াংতু বলে বসেছিলো, আমি ডমীলুকে চাই। ওর কথায় বাবা ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবতেও পারেননি মাংসিয়াংতু এ কথা বলার সাহস পাবে। বাবা ওকে রাজদরবার থেকে বের করে দিয়েছিলেন ওর স্পর্ধা দেখে। তারপর থেকেই সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নানা কৌশল এটেছিলো। তুমি বুঝতেই পারছো কেন আজ আমি ঐ শবাধারে মৃত হয়ে পড়ে আছি।

হ্যাঁ, আমি সব বুঝতে পারছি। তোমাকে যখন মাংসিয়াংতু বলছিলো.....

তুমি সব শুনেছিলে?

হ্যাঁ।

তবে তো সবই জানতে পেরেছো?

তোমার অনুমান সত্য।

তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে চলো?

কোথায় যাবে ডমীলু?

আমার বাবা সম্রাট আহমদুল্লার কাছে।

তুমি জানোনা ডমীলু কতদিন পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন?

আমার বাবা তাহলে জীবিত নেই?

না।

এ তুমি কি বলছো আগন্তুক?

অনেক দিন মানে-কয়েক হাজার বছর পূর্বে তোমার বাবা সম্রাট আহমদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমি বিশ্বাস করি না। এই তো সেদিন আমার বাবার চোখে ধোঁকা দিয়ে আমাকে মৃত বানিয়ে ঐ নরপশু মমি তৈরি করার ছলনায় এই শবাধারে আমাকে বন্দী করে রেখেছে। ক'দিনের কথা, আর তুমি বলছো হাজার হাজার বছর আগের......

একটু হেসে বললো বনহুর–মাংসিয়াংতুকে দেখেও কি তুমি বোঝোনি? প্রথম মাংসিয়াংতুকে কেমন দেখেছিলে আর আজ তাকে দেখে কি মনে হয় তোমার? তার চেহারা কি স্বাভাবিক লাগে?

বনহুরের কথায় আনমনা হয়ে যায় ডমীলু, কি যেন ভাবে সে, তারপর বলে-ওকে এমন বীভৎস চেহারায় দেখবো ভাবিনি তবে আমার মনে সন্দেহ হয়েছিলো সে যাদুকর, তাই ওটা তার একটা নতুন রূপ অথবা ছদ্মবেশ।

না, ওটা ওর নতুন রূপ বা ছদ্মবেশ নয়, সুদীর্ঘকাল ধরে সে গবেষণা করে যে ঔষধ তৈরি করেছিলো তাই সে পান করে অমরত্ব লাভ করেছে। সেই মহৌষধের গুণেই তুমি পিরামিড আর্মানহুডের অভ্যন্তরে আজও জীবন্ত অবস্থায় শবাধাবে সুস্থ দেহে অবস্থান করছে।

তুমি এসব জানলে কি করে আগন্তুক?

তোমার ও মাংসিয়াংতুর কথার মধ্যেই আমি সবকিছু বুঝতে পেরেছি এবং অনুধাবন করেছি। সত্যি মাংসিয়াংতুর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, কারণ তার সাধনা সার্থক হলেও যে আশায় সে এত কাল নিজকে জীবিত রেখেছিলো, শুধু তোমাকে পাবার জন্য কিন্তু তুমি তার সে সাধ পূর্ণ করতে স্বীকার করছে না।

না, মোটেই না, আমি ওকে সহ্য করতে পারি না। ও মানুষ নয়, পশু। আমি ওকে ঘৃণা করি।

ডমীলু!

হ্যাঁ আগন্তুক, সে যদি তোমার মত হতো তাহলে আমি তাকে খুব পছন্দ করতাম। তোমার নাম কি আগন্তুক? এখানে কেমন করে এসেছে তাও তত শোনা হয়নি আমার। বলোতত তোমার সব কথা?

বনহুরের মুখে একটু হাসির আভা ফুটে উঠলো, সেকালের মেয়ে হলেও ডমীলুর মধ্যে একটা তেজদীপ্ত ভাব রয়েছে, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলে মনে হচ্ছে তাকে। তার কথাবার্তায় এতটুকু জড়তা নেই। মনে পড়লো ক্লিওপেট্রা সম্রাজ্ঞীর কথা। হয়তো বা ডমীলুর মতই ছিলো সেই মহিমা, তার তেজদীপ্ত কথাবার্তার আভাস আজও ইতিহাস বহন করছে। সেই অদ্ভুত নারী মিসরীয় সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু ছিলো অস্বাভাবিক, সে কাহিনীও ছিলো অদ্ভুত। ক্লিওপেট্রার কথা ভাবছিলো বনহুর।

ডমীলু বললো–কি ভাবছো আগন্তুক? আমি তোমার মত একটি লোককে পাশে পেলে সত্যি বড় খুশি হবো, তবে আমাকে তোমার পরিচয় জানাতে হবে।

এবার বনহুর স্বাভাবিকভাবে বললো–আমার নাম শুনে তুমি কিছু অনুধাবন করতে পারবে না রাজকুমারী, তবু শোন, নাম আমার বনহুর।

বনহুর!

হ্যাঁ।

তার মানে?

দস্যু বনহুর।

তুমি ডাকু?

হ্যাঁ, তবে তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।

যদি চাও আমি তোমাকে অনেক ধনরত্ন-মণি-মাণিক্য দিতে পারবো। এই দেখো আমার শবাধারের চারপাশে কত ধনরত্ন……

ওসবে আমার লোভ নেই ডমীলু।

তবে তুমি কেমন ডাকাত? ধনরত্নে তোমার লোভ নেই?

না।

সত্যি তুমি আমার মত লোভ-লালসাহীন।

বললো বনহুর–তাই নাকি? তবে তোমার বাবা তোমার শবাধারের সঙ্গে এত ধনরত্ন মণি-মাণিক্য কেন দিয়েছিলেন?

এটা মিসরবাসীদের নিয়ম। তুমি মিসরবাসী হয়ে এ কথা জানোনা? শবাধারের সঙ্গে এসব দিতে হয়। তবে যার যেমন সামর্থ্য তেমনি দিয়ে থাকে। আমি তোমাকে সব দিয়ে দেবো, তুমি ডাকুই হও আর যাই হও যদি তুমি আমাকে আমার বাবার কাছে পৌঁছে দাও।

বনহুর ভাবলো, হায়রে অবুঝ মন, এখনও সে মনে করছে পৃথিবীর বুকে তার পিতা সম্রাট আহমদুল্লাহ জীবিত আছেন। বললো বনহুর–বলেছি তো তোমার পিতা এখন জীবিত নেই। বহুকাল পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে।

না, আমি বিশ্বাস করি না। আমাকে তুমি পৃথিবীর বুকে নিয়ে যাবে না?

যাবো কিন্তু কোথায় যাবে ডমীলু? আজ তোমাকে কেউ চিনবে না? তোমার আপনজন কাউকে খুঁজে পাবে না, একমাত্র মাংসিয়াংতুকে ছাড়া....

ও নাম আর মুখে এনো না। আমি সহ্য করতে পানি না তাকে। তার অস্তিত্ব আমার জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। আগন্তুক, তুমি আমাকে ওর কবল থেকে উদ্ধার করে। আমি আর এই পিরামিডের অভ্যন্তরে এক মুহূর্ত থাকতে পারছি না। তুমি আমাকে বাঁচাও. আগন্তক।

ডমীলু, আমি তোমাকে পৃথিবীর আলো বাতাসে নিয়ে যাবে কিন্তু তুমি কার কাছে যাবে? কোথায় যাবে? সেই রাজ্য আছে কিন্তু সেই সম্রাট নেই, সেই লোকজন আছে কিন্তু তোমার, আপনজন কেউ নেই। তুমি পৃথিবীর বুকে ফিরে গেলে বড় একা, যেমন এখানেও তুমি নিজকে একা মনে করছে, তেমনি......

তোমার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না।

বনহুর হেসে বললো–ঠিক আছে, তোমাকে নিয়ে যাবো তুমি যদি তাতে শান্তি পাও।

সত্যি নিয়ে যাবে? তুমি আমাকে এই অন্ধকার কবর থেকে উদ্ধার করবে?

করবো।

তুমি বড় ভাল। তোমার পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বর, তোমার বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা আমাকে বড় অভিভূত করেছে। তোমাকে আমি ভালবাসি আগন্তুক।

ডমীলুর কথায় বনহুরের ঠোঁটের কোণে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো। বহু নারীর কণ্ঠে বনহুর এ কথা শুনেছে। বড় পুরানো কথা, তবু আজ ডমীলুর কণ্ঠে সেই পুরানো কথার প্রতিধ্বনি নতুন করে বনহুরের মনে নাড়া দিলো। একটা জীবন্মত মেয়ের মধ্যেও প্রেমের গুঞ্জনধ্বনি, তার মধ্যেও জাগরিত রয়েছে ভালবাসার স্বপ্নসাধ। নারীহৃদয় বড় কোমল, মমতাময়ী স্নেহ-ভালবাসায় ভরপুর। ডমীলুও নারী, তাই তার ভেতরেও আছে প্রেম ভালবাসা, স্নেহ মায়া মমতা, এটা তার ভুল বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ডমীলু তার জীবনে পায়নি এসব, এ সব পাবার পূর্বেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো। যদিও সে একেবারে মরে যায়নি, তবুও মৃত, কারণ পৃথিবীর আলো, বাতাস, প্রেম-ভালবাসার স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত।

কি ভাবছো অমন করে? শুনেছি যারা দস্যু ডাকু, তারা বড় নির্দয় হয়। তুমিও কি তাই?

আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয় ডমীলু?

তুমি বড় ভাল মানুষ বলেই আমার ধারণা, কারণ মাংসিয়াংতু বড় হৃদয়হীন। দয়ামায়া বলতে তার কিছু নেই। আমাকে আমার বাবার স্নেহ থেকে সে বঞ্চিত করেছে। আমার চোখের জল তার মনকে বিচলিত করতে পারেনি। তুমি যাই বলল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

বনহুর তার চোখ দুটি তুলে ধরলো ডমীলুর মুখের দিকে।

ঐ মুহূর্তে শোনা গেলো সেই শব্দ, একটি বিকট শব্দের থেকে একটানা আওয়াজ।

ডমীলুর মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, বললো–আগন্তুক, তুমি আমাকে ওপাশের ঐ। ওষুধ খাইয়ে দাও, তারপর শবাধারে শুইয়ে রেখে চলে যাও।

তোমাকে দেখলে মাংসিয়াংতু মেরে ফেলবে। বড় নিষ্ঠুর সে.....

বনহুর তাকিয়ে দেখলো মণি-মাণিক্যের ঝুরির পাশে একটি বোতল জাতীয় পাত্র। তার মধ্যে গাঢ় সবুজ রঙের তরল পদার্থ। বনহুর বুঝতে পারলো মাংসিয়াংতু আসছে, দেহের শক্তির দ্বারা আশেপাশের পাথরের যতগুলো সরিয়ে ফেলছে। তবে কি বনহুর পূর্বের সেই শব্দ শুনছে। হ্যাঁ, এটা সেই শব্দই বটে। বললো বনহুর–ডমীলু, এ শব্দ কিসের?

ডমীল বললো–মাংসিয়াংতু একটি পথ তৈরি করছে যে পথে সে অতি সহজে। আর্মানহুডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এবং বের হবে। কোনো অস্ত্রদ্বারা সে পাথর কার্টে, এ শব্দ তারই। যখন সে হাঁপিয়ে পড়ে তখন চলে আসে এখানে। তাই আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। তোমাকে দেখলে সে ভীষণ রেগে যাবে এবং গলা টিপে হত্যা করবে। দাও, শিগগির ঐ বোতল থেকে আমাকে ওষুধ ঢেলে দাও।

বনহুর ডমীলুর কথামত কাজ করলো।

ওষুধ খাওয়ার পর পরই ডমীলু বনহুরের হাতের ওপর ঢলে পড়লো।

বনহুর অতি সন্তর্পণে ডমীলুর সংজ্ঞাহীন দেহটা শুইয়ে দিলো শবাধারের মধ্যে।

*

সামনে অগ্নিকুন্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মিসরীয় পর্বত গুহার এক অজ্ঞাত স্থানে ডাকু জঙ্গীশাহর আস্তানা। ডাকু জঙ্গীশাহ ভীষণ ক্ষুব্ধ, তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কে ঐ ব্যক্তি যে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। সামনের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডের লেলিহান শিখার রাশি তার চোহারায় এসে পড়েছে। তার দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

তার সামনে দন্ডায়মান অনুচরগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারও মুখে কোনো কথা নেই। সবাই ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে আছে জঙ্গীশাহর আদেশের প্রতীক্ষায়।

কে সেই ব্যক্তি যে আমাকে অপমানিত করেছে, আমার সমস্ত শ্রম পন্ড করে দিয়েছে। যাও, তোমরা খুঁজে বের করে সেই ব্যক্তিকে যার কাছে আমি জীবনে

প্রথম পরাজিত হলাম। যদি তার সন্ধান পাও ভাল, নইলে এই রিভলভারের গুলী হজম করতে হবে মনে রেখো। যাও লালজী বাহাদুর ও মঙ্গলনাথ, তোমাদের দুজনের ওপর আমি এর দায়িত্ব দিলাম। যাও।

আচ্ছা হুজুর। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো ওরা।

জঙ্গীশাহ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

তারপর বললো–আমার মুখের গ্রাস নিয়ে তামাশা। একটু থেমে অপর একজনকে ডেকে কিছু বললো তারপর বেরিয়ে গেল জঙ্গীশাহ। অপর ব্যক্তিও তার পেছনে পেছনে চলে যায়।

মুখে কালো রুমাল বাঁধা ঠিক ঐ ব্যক্তির বেশে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলো জঙ্গীশাহ। তার সংগে রাজপ্রহরীর বেশে সজ্জিত অপর অনুচর। একটি গাড়িতে তারা উঠে বসলো।

গাড়িখানা পর্বতমালার পাদদেশে অপেক্ষা করছিলো।

ওরা গাড়িতে চেপে বসতেই গাড়ি ছাড়লো।

মিসরীয় পর্বতমালার এ অংশে তেমন ঝোঁপঝাড় বা টিলা ছিল না। পথ কিছুটা সমতল তাই গাড়িখানা অনায়াসে চলতে লাগলো।

বহুক্ষণ চলার পর গাড়িখানা শহরের কাছাকাছি পৌঁছলো।

মাঝপথে একটি পুরোনো সরাইখানায় কিছু সময় অপেক্ষা করলো তারা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয়ে এলো।

ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে ছদ্মবেশি জঙ্গীশাহ বললো–তুমি গাড়ি নিয়ে হীমশালীং সরাইখানার সামনে অপেক্ষা করবে।

জ্বি আচ্ছা! বললো মারাঠা ড্রাইভার।

ড্রাইভারের গালপাট্টার রং ছিলো গাঢ় মেহগনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখ দুটো তার চক চক করে উঠলো।

জঙ্গীশাহ ড্রাইভারের পিঠ চাপড়ে ইংগিতে কিছু বললো। তারপর পুনরায় প্রবেশ করলো হীমশালীং সরাইখানার অভ্যন্তরে।

*

সম্রাট আবদুল্লাহ বসে ছিলেন রাজপ্রাসাদের বিশ্রামাগারে। একটু পূর্বে কন্যা মীরার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছিলো। নানা কথার মধ্যে এসে পড়েছিলো সেই অজানা ব্যক্তির কথা। যে নিজ জীবন বিপন্ন করে উদ্ধার করেছিলো সেদিন মীরাকে।

সেদিনের পর থেকে মীরা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি তাকে, সেই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তার কানের কাছে সর্বক্ষণ প্রতিধ্বনিত হয়। কালো রুমালে মুখের অর্ধাংশ ঢাকা একটি মুখ-কে সেই ব্যক্তি। পিতার সঙ্গে যখন আলাপ-আলোচনা করছিলো তখন মীরা পিতাকে মনের কথা বলতে পারছিলো না তবুও একটি দুর্বলতা তাকে অধীর করে তুলছিলো।

সম্রাট আবদুল্লাহ বলেছিলেন-মা, আমি ঘোষণা করেছিলাম তোমার উদ্ধারকারীকে আমি দেখতে চাই, তার পরিচয় জানতে চাই। কিন্তু কই, এলোনা তো সে? জানি না কে সেই ব্যক্তি।

মীরা কোনো জবাব দিতে পারেনি, কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বেরিয়ে এসেছিলো পিতার বিশ্রামকক্ষ থেকে।

মীরা চলে আসার পর পরই হঠাৎ ধূমকেতুর মত কক্ষে প্রবেশ করে সেই কালো রুমালে মুখমন্ডলের অর্ধাংশ ঢাকা ব্যক্তি। সম্রাটের সামনে দন্ডায়মান হতেই ফিরে তাকালেন তিনি। ভীষণভাবে চমকে উঠে বললেন-কে তুমি?

রুমালে মুখমন্ডল ঢাকা ব্যক্তি বললো–আমি সেই, যাকে আপনি দেখতে কামনা করেছিলেন।

তুমি....তুমি আমার ঘোষণা শুনে এসেছ?

হ্যাঁ। বললো আগন্তুক।

সম্রাট বিচলিত হলেও পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিলেন, তিনি বললেন-তুমিই তাহলে আমার কন্যা মীরার উদ্ধারকারী?

চিনতে আপনার এত বিলম্ব হবে ভাবতে পারিনি সম্রাট। কারণ আপনার কন্যা মীরার মুখে আপনি নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন, তাই চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই।

সম্রাট আবদুল্লাহ আসন ত্যাগ করে হাত ধরে তাকে বসালেন এবং বললেন-আপনি কে জানিনা তবে আমার কাছে আপনি পরম আপন জনের চেয়েও আপন। কে আছো মীরাকে পাঠিয়ে দাও...মীরা মা আমার, দেখবে এসো তিনি এসেছেন, যার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

একটু পরে মীরা প্রবেশ করে সেই কক্ষে।

বিস্ময় নিয়ে তাকায় সে ঐ কালো রুমালে ঢাকা মুখটার দিকে। মুখমন্ডলের অর্ধাংশ ঢাকা থাকলেও মীরা তার চোখমুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

আগন্তুক মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো, যদিও তার মুখ দেখা যাচ্ছিলো না তবুও তার হাসির প্রতিধ্বনি কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো, বললো সে রাজকুমারী, চিনতে পারছেন না? আমি সেই ব্যক্তি, যে একদিন আপনাকে দস্যু বনহুরের অনুচরদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলো।

না, তুমি সে নও। এ কণ্ঠস্বর সে কণ্ঠস্বর নয়। তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমি জানি তুমি সে নও। মীরা পিতার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

আগন্তুক মুহূর্ত বিলম্ব না করে মীরাকে জোরপূর্বক তুলে নিলো কাঁধে।

সম্রাট আবদুল্লাহ হতবাক হয়ে যান, তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। স্থবিরের মত তাকিয়ে আছে। একদিন যে মীরাকে রক্ষা করেছে দুস্কৃতিকারীদের কবল থেকে, আজ সেই ব্যক্তি তাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গেলো।

কালো রুমালে মুখের অর্ধাংশ ঢাকা ব্যক্তি মীরার মুখে একটি রুমাল গুঁজে দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়েছিলো, তাই মীরা চিৎকার করতে পারলো না।

মীরাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর সম্রাট যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। চিৎকার করে ডাকলেন-কে কোথায় আছো ছুটে এসো, মীরাকে নিয়ে দস্যু পালিয়েছে। ছুটে এসো, ছুটে এসো..

প্রহরীগণ চারদিক থেকে ছুটে এলো কিন্তু তখন দুষ্কৃতকারী ততক্ষণে মীরাকে নিয়ে পালিয়েছে।

সামান্য সময়ের মধ্যেই এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলো যা কেউ ভাবতে পারেনি। রাজপ্রাসাদের ঘুমন্ত মানুষগুলো জেগে উঠলো। এক একজন এক একদিকে ছুটলো মীরার সন্ধানে। কিন্তু কোথাও তার খোঁজ পেলো না।

একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো প্রাসাদের পেছন দিকে। আগন্তুক মীরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেই গাড়িতে এসে বসলো। মীরার হাত দুখানা বাধলো সে দ্রুতগতিতে। পেছন আসনে ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজে ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

রাজপথ ছেড়ে গলিপথে গাড়িখানা ছুটলো। শীতের রাত, বারটার পর পরই রাজপথগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। পথ তাই নীরব। শুধু লাইট পোষ্টগুলো নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িখানা মীরাকে নিয়ে উল্কাবেগে ছুটলো।

জঙ্গীশাহর মুখে কুৎসিত এক হাসির আভাস। একদিন সে মীরাকে চুরি করে এনেছিলো রাজপ্রাসাদ থেকে। শুধু মীরাকেই নয়, তার দেহের মণিমুক্তাখচিত অলংকারগুলোও সে হস্তগত করতে চেয়েছিলো কিন্তু পারেনি, কে এক অজানা ব্যক্তি তার সব আশা-বাসনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলো। ঐ দিন সে নিজকে বড় অপমানিত মনে করেছিলো, কারণ জঙ্গীশাহ জানতে মিসরে তার মত শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান ডাক আর কেউ নেই। কিন্তু সেদিন যখন ঐ ব্যক্তির কাছে তার পরাজয় হলো, তখন সে রাগে ফেটে পড়েছিলো, ঐ ব্যক্তিকে সে দেখে নেবে মনে মনে শপথ গ্রহণ করেছিলো। আরও একটা আক্রোশ তাকে আরও হিংস্র করে তুলেছিলো, তা হলো ঐ ব্যক্তি তার গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, এর প্রতিশোধ সে নেবে। আজ জঙ্গী শাহর আনন্দ ধরে না, মীরাকে সে হরণ করে এনেছে, এবার কে তাকে বাধা দেবে! বললো সে-ড্রাইভার, আস্তানায় চলো। তারপর মীরাকে লক্ষ্য করে বললো–রাজকন্যা, এবার কে তোমাকে উদ্ধার করে দেখবো। এবার তুমি জঙ্গী শাহর কবল থেকে রক্ষা পাবে না সুন্দরী।

মীরার হাত-পা বাঁধা, মুখে রুমাল গোঁজা, তাই সে জঙ্গী শাহর কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না।

গাড়িখানা তখন ছুটে চলেছে।

[পরবর্তী বই পিরামিডের অভ্যন্তরে (২)]

পূর্ববর্তী:

« ৮.১১ লীলা নাগের হীরক হার

পরবর্তী:

৮.১৩ পিরামিডের অভ্যন্তরে (২) »